ডিটেকটিভ

হেকিম হোমস

প্রিন্স আশরাফ

পাঠক গোয়েন্দা গল্প পড়তে ভালোবাসে। কিন্তু তা নিছক গল্প পড়াই হয়। নিজেকে সেই গল্পের গোয়েন্দা হিসাবে উপস্থাপন করা আর হয়ে ওঠে না। গল্পের শেষে গোয়েন্দার হাতেই সমস্যার সমাধান হয়, পাঠক সমাধান পেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে!

কিন্তু পাঠকরাই যদি গোয়েন্দা হয়ে যায় তাহলে কেমন হয়? গোয়েন্দার সাথে মিলে রহস্য উদঘাটন না করে পাঠক নিজেই যদি নেমে পড়ে রহস্য উদঘাটনে? পাঠক নিজেই যদি রহস্যের সমাধানে এগিয়ে আসে? নিজেই সেই রহস্য সমাধান করে? তখন কেমন হয়?

ডিটেকটিভ হেকিম মুনশি সেরকমই এক গোয়েন্দা গল্পের সংকলন যেখানে পাঠকই গোয়েন্দা! প্রতিটি গোয়েন্দা গল্পই শেষ হয়েছে পাঠকের হাতে সমাধান খুঁজতে দিয়ে। সেই সমাধান খুঁজতে গিয়ে পাঠককে গল্পটা শুধু পাঠ করলেই হবে না মাথা খাটিয়ে রহস্যের সূত্র ধরে এগিয়ে যেতে হবে সমাধানে। তবেই মিলবে মুক্তি!

ডিটেকটিভ হেকিম মুনশিতে হেকিম মুনশির গোয়েন্দাগিরি তো থাকছেই, সেই সাথে পাঠক শখের গোয়েন্দা নাভিদের সহকারী হয়ে করতে পারবেন গোয়েন্দাগিরি, পেশাদার সরকারি গোয়েন্দা রাশাদ রাহাকেও জ্যোতির্ময় বুড়োর মতো করে সাহায্য করতে পারেন, ক্ষ্যাপাটে গবেষক মফেজ ডাক্তারের অদ্ভুত সব কেসেও শামিল হতে পারেন।

তাহলে নেমে পড়া যাক গোয়েন্দা গল্পের রহস্যের সমাধানে...

প্রচ্ছদ: নিয়াজ চৌধুরী তুলি

গোয়েন্দা গল্প : মগজ ধোলাই ২

ডিটেকটিভ হেকিম হোমস

গোয়েন্দা গল্প : মগজ ধোলাই ২

ডিটেকটিভ হেকিম হোমস

প্রিন্স আশরাফ

গোয়েন্দা গল্প মগজ ধোলাই ২

ডিটেকটিভ হেকিম হোমস

প্রিন্স আশরাফ

প্রকাশকাল বইমেলা ২০২০
প্রকাশক মো. আবদুল কাদের
বাবুই ২/২সি, পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০
স্বত্ব লেখক
প্রচ্ছদ নিয়াজ চৌধুরী তুলি
অনলাইন পরিবেশক রকমারি
মূল্য ২৫০ টাকা

Ditective Hekim Homes by Prince Ashraf
Published by Md. Abdul Kader
Babui 2/2C Purana Paltan, Dhaka
Cell Phone +88 01715331098
email :: babuiprokash@gmail.com
Price Tk 250 :: $10

ISBN : 978-984-8025-52-9

ঘরে বসে বইটি পেতে যোগাযোগ করুন
www.rokomari.com/babui
সেন্টার : ১৬২৯৭ সেলফোন : ০১৫১৯৫২১৯৭১

www.babuiprokash.com

উ ৎ স র্গ

অকালপ্রয়াত
মিশাল হোসেন অভিকে

ভূমিকা

যেকোনো ডিটেকটিভ কাহিনি পড়ার সময় পাঠকরা ডিটেকটিভের সাথে একাত্ম হয়ে ইনভেস্টিগেশনে অংশ নিতে চায়। পাঠকরা গোয়েন্দা না হয়েও গোয়েন্দার সাথে শামিল হয়ে এক ধরনের শিহরণ অনুভব করে। নিজেও যেন হয়ে ওঠে এক একজন ডিটেকটিভ।

কিন্তু গোয়েন্দার রহস্য-উদঘাটনের সাথে শরিক না হয়ে পাঠক নিজেই যদি সেই রহস্য উদঘাটনে নেমে পড়েন, তখন কেমন হয়?

পাঠককে ডিটেকটিভ করে তুলতে সেরকম কিছু ডিটেকটিভ গল্প নিয়ে সাাজানো হয়েছে এবারের 'ডিটেকটিভ হেকিম হোমস।'

গ্রামবাংলার বয়সী হেকিম মুনশি যখন শার্লক হোমসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রহস্যের সমাধান করেন, তখন আপনিও নেমে পড়তে পারেন হেকিম মুনশির সাথে। মগজ ধোলাইয়ের অন্য গোয়েন্দা চরিত্রের মধ্যে এবার নতুন করে যুক্ত হয়েছে মিসটিক তমাপ্পি। এইসব ডিটেকটিভদের সাথে আপনিও নেমে পড়তে পারেন রহস্যের সমাধান করতে।

পাঠক হয়ে নয়, এবার নিজেই নেমে পড়ুন ডিটেকটিভের ভূমিকায়।

প্রিন্স আশরাফ
মিরপুর, ঢাকা

সূচি

জবানবন্দি	৯
রান্নাঘরের কারসাজি	১২
বাগানে খুন	১৬
শেয়াল দেবতা রহস্য	২০
ডিটেকটিভ হেকিম হোমস	২৫
অদ্ভুত গোলমাল	২৯
হত্যারহস্য	৩৪
গোয়েন্দা যখন হেকিম মুনশি	৩৮
অপহরণ রহস্য	৪৩
ইশারা	৪৭
ঘোড়া ধরা সহজ নয়	৫২
হেকিম মুনশির হীরে রহস্য	৫৬
মূর্তি উধাও	৬০
মিউজিয়াম রহস্য	৬৪
হত্যা না আত্মহত্যা?	৬৭
একটুর জন্য	৭২
মিসটিক	৭৬
ট্রেনে ডাকাতি	৮০
হীরের আংটি	৮৪
হেকিম মুনশি ও খুনি	৮৮
হেকিম মুনশির রহস্যভেদ	৯২
ভুল	৯৬
ওল্ড কিউরিও শপে চুরি	১০০

জবানবন্দি

ইনভেস্টিগেটর রাশাদ রাহা আবারও নতুন ঝামেলায় জড়িয়েছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ইনভেস্টিগেশনের কোনো সুরাহা সে করতে পারছে না। ঘটনাটা দুই মাস গড়িয়ে গেলেও তার তদন্তে প্রকৃত অপরাধী এখনও ধরা পড়েনি। পড়ার সম্ভাবনাও নেই!

জ্যোতির্ময় দাদুর বাড়িতে এসে অবাক হলেন রাশাদ রাহা। এই সাতসকালে দাদু লনে রোদ পিঠ করে বসে আছেন। দাদুর সামনে ল্যাপটপে ফেসবুকের পেজ ওপেন দেখা যাচ্ছে। ল্যাপটপের স্ক্রিনের ছায়ায় রাশাদের অবয়ব দেখে জ্যোতির্ময় দাদু বললেন, 'যুগের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে আর চলছিল না। তাই একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্টও খুলে ফেললাম। তোকে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টও পাঠিয়ে দিয়েছি, অ্যাকসেপ্ট করে নিস।'

রাশাদ বিরস মুখে বলল, 'একটা কেসের চাপে এমন ফেঁসে গেছি, ফেসবুক দেখারও টাইম পাইনি, দাদু।'

জ্যোতির্ময় দাদু ফেসবুকে একটা স্ট্যাস্টাস মেরে দিয়ে বললেন, 'খোলাসা করে বল তো দেখি, কী ঘটনা? আমার মগজ থেকে কিছু বের হয় কিনা?'

'সেজন্যই তো আপনার কাছে এসেছি দাদু। ঘটনাটা মাসতিনেক আগের।'

'ঠিক ঠিক তারিখ বল। দরকার হয় মোবাইলে নথি দেখে বল। গোয়েন্দাগিরিতে মাসতিনেক, প্রায়, যদি বলে কোনো শব্দ নেই।'

রাশাদ মোবাইলে সংরক্ষিত তথ্য বের করল। 'ফেব্রুয়ারি মাসের তিন তারিখের ঘটনা। ঘটনাটা ঘটেছে পুলিশ ফাঁড়িতে। ওখানে একজন পুলিশকে নিজ রুমে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রথমে আত্মহত্যা মনে করা হলেও পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মাথার পেছনে চুলের মধ্যে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। ভোঁতা ভারী হামানদিস্তা টাইপের কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। পরে অজ্ঞান করে আত্মহত্যা বোঝাতে গলায় গামছা পেঁচিয়ে জানালার গ্রিলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু পা মাটিতে লেগে ছিল।'

রাশাদের মনে হলো দাদু ঠিকমতো তার কথা শুনছেন না, ফেসবুকের একটা পোস্টে কী যেন কমেন্ট লিখছেন। সে একটু থামতেই দাদু বললেন, 'বলে যা।'

'আত্মহত্যা থেকে হত্যা প্রমাণিত হলেও তার হত্যাকারী কে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হত্যাকারী কে, তাও ধরতে পারিনি। কেসটা পিবিআইতে দেয়া হয়েছে। এবং এখন আমাকেই তদন্ত করতে হচ্ছে।'

'তোর কাছে পোস্টমর্টেমসহ কেসের ডকুমেন্ট যেগুলো আছে এখনই আমাকে মেইল বা ফরোয়ার্ড করে দে। আমি দেখি। এই ফাঁকে তোকে চা-নাশতা দিতে বলি। মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে সকালে না খেয়েই বেরিয়ে পড়েছিস।'

রাশাদ রাহা ফাইলটা ফরোয়ার্ড করে দিল। দাদু মনোযোগ দিয়ে ফাইলটাতে চোখ বুলাতে লাগলেন। কেয়ারটেকার ট্রেতে করে চা-নাশতা দিয়ে গেছে। রাশাদ নাশতায় মনোযোগ দিল।

'ওই ভবনে দেখছি সব মিলিয়ে সাতাশিজন কনস্টেবল থাকে। তিনজন ওইদিন ছুটিতে থাকলে বাকি থাকে চুরাশিজন। এবং সবারই ওই রুমে যাওয়ার এবং খুন করার কারণ থাকতে পারে। তার মানে সন্দেহের তালিকায় চুরাশিজন কনস্টেবল। ওদের সবাইকে কি জেরা করা হয়েছিল? অ্যালিবাই দেখা হয়েছিল?'

'না দাদু, একে তো একজন সদস্য মারা যাওয়ায় ওদের মধ্যে ভীতি কাজ করছিল। দ্বিতীয়ত এই বিষয়টা নিয়ে কর্তাব্যক্তিরা খুব বেশি কিছু করতে চায়নি। আর অ্যালিবাই বলতে ঘটনাটা দুপুরের দিকে হওয়ায় সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল, এটাই জানা যায়।'

'হু, বুঝতে পেরেছি। কারো সঙ্গে শত্রুতা ছিল, এরকম মনে হয়েছে কি?'

'তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। একটু চুপচাপ ধরনের ছিল। বন্ধুও তেমন ছিল না।'

'ঠিক আছে, কেসটা তিন মাস হয়ে গেছে। কাজেই আরো কিছু দিন অপেক্ষা করলে অসুবিধে নেই। এখন তোকে আমি যে কাজটা দেব সেটা করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'তুই ওই ব্যারাকে গিয়ে যেদিন ডেডবডি পাওয়া যায় ওইদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কে কখন কী করেছে তার পূর্ণ জবানবন্দি লিখিত দিতে বলবি। ওগুলো আমাকে মেইল করে পাঠিয়ে দিবি। চুরাশিজনের সবার দিতে বলবি। আপাতত এটাই কাজ।'

দাদু আবার ফেসবুকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তিনদিনের মধ্যেই রাশাদ রাহা দাদুর কাছে সবগুলো লিখিত জবানবন্দি

মেইল করে পাঠিয়ে দিল। বাইশটার মতো জবানবন্দি প্রায় হুবহু এক। কারণ ওই দিন ওরা সবাই একই ডিউটিতে ছিল। বারোজন একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে ছিল সারাদিন। ওদের জবানবন্দিও এক। এবং জোরালো অ্যালিবাই পাওয়া গেল। আর পঞ্চাশজনের জবানবন্দি ভিন্ন হওয়ার পরও রাশাদ সবগুলোই দাদুর কাছে পাঠিয়ে দিল, যদিও আলাদা আলাদা ফাইল করে দিল।

দাদু মেইল ওপেন করে সবগুলো দেখলেন। শেষমেশ বাছাই করে পনেরোটা জবানবন্দি আলাদা করলেন।

দাদু রাশাদকে ই-মেইল করে জানাল, এই পনেরোজনের জবানবন্দি আবার ঠিক পনেরো দিন পরে লিখিত দিতে বলবি। এবং পুরোটাই গোপনে, যেন একজনের জবানবন্দির কথা আরেকজন জানতে না পারে।

রাশাদ একটু অবাক হলো। একই জবানবন্দি কেন আবার নিতে হবে! নিশ্চয় দাদু কোনো একটা ক্লু পেয়েছেন, হয়তো হত্যাকারী কে তা সন্দেহ করেছেন।

রাশাদের আর ধৈর্য রইল না। সে ঠিক পনেরো দিন পরে পনেরোজনের নতুন জবানবন্দি নিয়ে দাদুর সঙ্গে দেখা করতে এল। দাদু জবানবন্দিগুলো নিয়ে আগেরটার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখলেন। দাদুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। দুটো জবানবন্দির দিকে নির্দেশ করে বললেন, এই তোর খুনি! তিন মাস আগের জবানবন্দি হুবহু এক!

রাশাদ রাহাও ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

এখন পাঠক বলুন তো, দাদু কীভাবে হত্যাকারীকে ধরতে পারল?

রান্নাঘরের কারসাজি

কয়েকটা গোয়েন্দাগিরিতে নারীমহলে তমাপ্পির বেশ নামডাক হয়েছে। সে এখন গোয়েন্দাগিরিকে পেশা হিসেবে নেয়া যায় কিনা তা চিন্তাভাবনা করছে। চিন্তাভাবনার ফল হলো থানাওয়ালাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও দহরম-মহরম বেড়েই চলেছে। নারীঘটিত কোনো সমস্যা হলেই থানা থেকে তার ডাক পড়ে। আর ডাক না পড়লেও মাঝে মাঝে সে নিজেই পরিচিত থানায় গিয়ে কেসের খোঁজখবর করে।

সে রকমই সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তমাপ্পি থানায় এসেছে। তমাপ্পিকে দেখে থানার পরিচিত দারোগা মনির কামাল আন্তরিকভাবে বললেন, 'কী সৌভাগ্য! মনে মনে আপনাকে স্মরণ করতেই আপনি এসে হাজির! অনেক দিন বাঁচবেন বোঝা যায়।'

তমাপ্পিও এক গাল হেসে বলল, 'হঠাৎ মনে মনে এই অধমকে কেন স্মরণ করছিলেন জানতে পারি?'

'স্মরণ নয়, আপনি নিজে থেকে না এসে পড়লে থানা থেকে ফোনই দিতাম। আর আপনাকে কেন স্মরণ করি তা তো বুঝতেই পারছেন।'

'কেসটা কী?'

'পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড এবং সাসপেক্টের মধ্যে কয়েকজনই নারী। নারীর মনের গতিপ্রকৃতি নারীরাই ভালো বোঝে, তাই আপনার কথাই ভাবছিলাম। তাছাড়া এর মধ্যে রান্নাবান্নার ব্যাপারও জড়িত।'

'ঘটনাটা একটু খুলে বলুন।'

'ঘটনাটা শুধু বলবও না, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আপনার সঙ্গে কাউকে নিতে চাইলে পথ থেকে তুলে নিতে পারেন। পথে যেতে যেতে ঘটনাটা বলা যাবে।'

তমাপ্পি জানে, এসব ব্যাপারে পূর্ণতার ঝোঁক কতটা বেশি। তাকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে মুখ ফুলিয়ে গোস্বা করে থাকবে। তাছাড়া শুক্রবার ছুটি থাকায়

পূর্ণতা বাড়িতেই থাকবে। পূর্ণতাকে ফোন দিল তমাপ্পি।

'হ্যাঁ, তমাপ্পি। কোনো রহস্যের সন্ধান পেয়েছ নাকি? আমাকে না নিয়ে গেলে তোমার সঙ্গে আর কথাই বলব না।'

'ঠিক আছে, তুই রেডি হয়ে নে। আমি তোকে গাড়িতে তুলে নিচ্ছি।'

পুলিশের গাড়িতে ওঠার পরেই দারোগা ঘটনাটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্ণতাকে গাড়িতে তুলে নেয়ার পরেই ঘটনাটা বলার অনুরোধ করল তমাপ্পি।

বাসা থেকে পূর্ণতাকে তুলে নেয়ার পরে দারোগা বলল, 'ঘটনাটা ঘটেছে হোটেল সুগন্ধায়। আমরা এখন সেখানেই যাচ্ছি। ঘটেছে হোটেলের বলরুমের একটা রান্নার শোতে। রান্নার শোটা আবার টেলিভিশন চ্যানেল টেনের 'শুধুই রান্না' অনুষ্ঠানের জন্য টেলিকাস্ট করা হচ্ছিল। আসলে কী, এক ঢিলে দুই পাখি মারা। অর্থাৎ অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের রান্নার অনুষ্ঠানে বিদেশি রান্না দেখিয়ে তা খাওয়ানো এবং সেই রান্নার অনুষ্ঠানটাই টিভিতে প্রচার করে টিভির রান্নার অনুষ্ঠানের ঝামেলা কমানো। যাই হোক, রান্নার অনুষ্ঠানে রান্নার দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত রন্ধনশিল্পী বিনীতা রুমা। তার সহযোগী হিসেবে কাজ করছিল প্রিয় মুখ সঞ্চিতা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান নায়িকা মনিকা তিথি। প্রখ্যাত রন্ধনশিল্পী সায়মা সাদেক, যিনি কয়েকটা টিভি চ্যানেলে নিয়মিত রান্নার প্রোগ্রাম করে থাকেন, এখনও পর্যন্ত রন্ধনজগতে জনপ্রিয়তায় তিনি শীর্ষে। তবে বিনীতা রুমাও কম যান না। প্রধান অতিথি টিভি চ্যানেলের স্বত্বাধিকারী মাহবুব রহমান। রান্না শেষ হলে তা সবাইকে গরম গরম পরিবেশন করে বিনীতা রুমা ও সহযোগী সঞ্চিতা। অনুষ্ঠান শেষ হলে তার কিছুক্ষণ পরে রন্ধনশিল্পী সায়মা সাদেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিতে নিতেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ হিসেবে ফুডং পয়জনিং বা বিষক্রিয়ার কথাই পাওয়া যায়। কিন্তু ওই একই খাবার অনুষ্ঠানের অন্যরা খেলেও আর কারো বিষক্রিয়া না হওয়া আমরা এই রহস্যের কিনারা করতে পারছি না। বুঝতেই পারছি পরিকল্পিত খুন। কিন্তু কীভাবে?

'রান্নার অনুষ্ঠানের পুরো ভিডিও ফুটেজ তো আপনাদের কাছে আছে, তাই না?' তমাপ্পি জানতে চাইল।

'তা আছে। আমরা বারবার করে ওটা দেখেছি। কিন্তু ওর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়েনি। এমনকি টিভি চ্যানেলে প্রচারের উদ্দেশ্যে খাবার পরিবেশন ও গলাধঃকরণও ভিডিও করা আছে, তাতে কোনো কিছু মেশানোর দৃশ্য চোখে পড়েনি।'

'হুঁ। ঘটনাস্থলে গেলে এবং ভিডিও ফুটেজগুলো দেখলে বুঝতে পারব কোনো অসংগতি আছে কিনা।' তমাপ্পি গম্ভীর স্বরে বলল।

হোটেল সুগন্ধার বলরুম পুলিশের ইনভেস্টিগেশনের জন্য ফাঁকা রাখা হয়েছে। আজ বিকেলের পর থেকে ওখানে প্রোগ্রামের শিডিউল আছে। যা তদন্ত করার এখনই করতে হবে। তদন্তের স্বার্থে ক্রাইম সিন যেরকম ছিল সেরকমই আছে অর্থাৎ রান্নার পাত্র যেগুলো যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে। ফরেনসিক তদন্তের জন্য কিছু খাবারেরর নমুনা নেয়া হলেও তাতে বিষক্রিয়ার কোনো চিহ্নই পাওয়া যায়নি।

তমাপ্পি রান্নার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'অন্য ভিকটিম, রন্ধনশিল্পী এবং তার সহযোগীকে জেরা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে। বরাবরের মতোই তাতে কিছু বেরিয়ে আসেনি। ওরা অন্যদিনের মতোই রান্নার অনুষ্ঠান করছিল। অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি।'

'হু। এখন সব কিছুই শুধুমাত্র রান্নার অনুষ্ঠানের ধারণ করা ভিডিওর ওপরেই নির্ভর করছে।' তমাপ্পি বলল। 'ভিডিও কি দেখানোর ব্যবস্থা করা যায়?'

'হ্যাঁ। ওরা কি জানি বলে রাফ কাটসহ আছে তো, দেখতে গেলে বেশ সময় লাগবে। আমি আপনাদের দেখানোর ব্যবস্থা করে একটু ঘুরে আসছি।'

দারোগা ওদেরকে ভিডিও রুমে ভিডিও দেখানোর ব্যবস্থা করে দিল।

ভিডিওতে ওরা রান্নার অনুষ্ঠানের সব খুঁটিনাটি দেখতে লাগল। প্রথম পর্ব থেকেই একেবারে ফাইনাল পর্যন্ত খুব মনোযোগ দিয়ে বারবার ফরোয়ার্ড রিওয়াডিং করে দেখতে লাগল দুজনে।

তমাপ্পি আবার ভিডিওগুলো দেখতে দেখতে পূর্ণতাকে বলল, 'ব্যাপারটা খেয়াল করেছিস?'

পূর্ণতা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী ব্যাপার? সবগুলোই বিদেশি রান্নার দেশি সংস্করণ, তাই?'

'হ্যাঁ। তা তো আছেই। কোন খাবারে কী মেশাচ্ছে সেটাই আমাদের খুব ভালো করে দেখতে হবে। আলু, পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এসব দেশি জিনিসের পাশাপাশি বিদেশি সস, ক্যাপসিক্যাম, ভিনেগারের সঙ্গে আরো কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে। ওগুলোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে।'

'কিন্তু পুলিশের লোক তো বললেনই সব খাবারই ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে। তাতে বিষাক্ত কোনো কিছু পাওয়া যায়নি।'

'হু। ল্যাব টেস্টের ফলাফলের কপি আমার কাছে আছে। কিন্তু তাতেই সব কিছু প্রমাণ হয়ে যায় না। অনেক সময় এমন অনেক খাবার আছে, যা বাইরে থেকে বিষাক্ত নয়। কিন্তু পাকস্থলীতে গেলে জারক রসের সঙ্গে মিশে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।'

'সে রকমটি হলে তো সবার পাকস্থলীর জারক রসের সঙ্গে মিশে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কারোর কারোর পাকস্থলীর রস তো আর বিশেষ হতে পারে না!'

'ঠিকই বলেছিস। এই লাইনে হবে না। অন্য লাইনে ভাবতে হবে। ভিডিওটা ভালো করে দেখ তো, রাঁধুনি হাতসাফাই করে ওর মধ্যে কোনো বেখাপ্পা বা বিজাতীয় জিনিস খাবারে মিশিয়েছে কিনা?'
'ঠিক আছে। এসো, দুজন মিলেই দেখি।' পূর্ণতা বলল।
ভিডিও দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। তমাপ্পি বলল, 'ব্যাপারটা খেয়াল করেছিস?'
'খোঁপা ঠিক করার ব্যাপারে বলছ তো? আমি আগেও দেখেছি। স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। রাঁধুনি ভদ্রমহিলা গোটা ভিডিওর মধ্যে বেশ কয়েকবার মাথার খোঁপাটা শক্ত করে বেঁধে নিয়েছেন। মনে হচ্ছে ওটা ওনার মুদ্রাদোষ।'
'এখানেই খটকা। ওটা মুদ্রাদোষ নয়, ইচ্ছে করেই প্রথম থেকেই এই চালাকিটা করেছে, যাতে তোমার মতোই দর্শকরা ওটা মুদ্রাদোষই ভাবে। আমার ধারণা, হাতসাফাইয়ের কারসাজিটা মাথার চুলের খোঁপা শক্ত করে বাঁধার মধ্যেই করা হয়েছে।'
'মানে তুমি বলতে চেয়েছো, মাথার চুলের ভেতরে রাখা বিষ হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে এনে খাবারে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।'
'হু। সেরকমই। তবে সেটা বিষ না হয়ে বিষাক্ত কোনো খাবার হতে পারে, যা শুধু নির্দিষ্ট একজনকেই কৌশলে দেয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে এরকম কোনো কিছু আছে সেটাই আমাদের দেখতে হবে।'
'আছে। একেবারে শেষে। মাশরুম টি। ওতে অবশ্য বিশেষ কোনো উপকরণ ব্যবহার করা হয়নি। চা, চিনি, পানি আর বিদেশি বিশেষ কিছু মাশরুমই শুধু আছে ওর মধ্যে। এতে তো কারোর সন্দেহ করার কথা নয়।'
'হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিকই আছে। কিন্তু তার মধ্যেও কোথাও যেন একটা ঘাপলা আছে। ভিডিওটা আবার রিওয়াইন্ড কর তো, আরেকবার দেখি। ঠিকই তো আছে সব, পানি ফোটানো হচ্ছে এক কেটলিতে, চা পাতা, চিনি সব কিছুই মেশানো হয়েছে এক পাত্রে। তারপর চায়ের কাপে চা ঢালা হলো। প্রতিটি চায়ের কাপে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মাশরুম মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।' একটু ভাবল তমাপ্পি। তারপর হঠাৎ করে তার মুখ উদ্ভাসিত হলো।
তমাপ্পি ভিডিওটা আবার টেনে দিতে দিতে বললেন, 'এখন আমার কাছে সবকিছুই পরিষ্কার, তুই কি বুঝতে পেরেছিস?'
পূর্ণতা অবাক চোখে তমাপ্পির দিকে তাকিয়ে থাকে।
তমাপ্পি হাসতে হাসতে বলল, 'বুঝতে পারিসনি তাই না। দেখ তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

এখন পাঠক বলুন তো, কে খাবারকে বিষ মিশিয়েছিল? কোন খাবারে? কীভাবে?

বাগানে খুন

কোনো রহস্যের সমাধান না করতে পারলেই সরকারি ইনভেস্টিগেটর রাশাদ রাহার প্রথমেই জ্যোতির্ময় দাদুর কথা মনে পড়ে। আজ পর্যন্ত তার সব অমীমাংসিত রহস্যেরই সুরাহা করে দিয়েছেন জ্যোতির্ময় দাদু। আর এই কেসের ক্ষেত্রে জ্যোতির্ময় দাদু ছাড়া কোনো উপায় নেই, সে ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। সরকারের উচ্চপদস্থ হোমরাচোমরা ভদ্রমহোদয়ের বাগানে কোনো খুন হলেও এবং সেই খুনের সন্দেহভাজনরা হাতেনাতে ধরা পড়লেও প্রকৃত খুনিকে বের না করে স্বস্তি নেই।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জ্যোতির্ময় দাদু এখন ঢাকাতে নেই। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদলের মানসে তিনি নারিকেল জিঞ্জিরা বা সেন্টমার্টিনে গিয়ে বসে আছেন। সভ্যতার সঙ্গে বিবর্জিত থাকার জন্য নিজের মোবাইল ফোনও অফ রেখেছেন। আর রাশাদ রাহা ভালো করেই জানে মোবাইলে এই কেসের রহস্যের সুরাহা হবে না। তাকে সেন্টমার্টিনেই যেতে হবে।

সরকারি খরচে বিমানে কক্সবাজারে এসে সেন্টমার্টিন যেতেও একদিন লেগে গেল। রাতটা থেকে গেল কোস্টগার্ডের রেস্ট হাউসে। জ্যোতির্ময় দাদু কেয়ারটেকারকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা কটেজ ভাড়া করে নিরিবিলি আছেন। কেয়ারটেকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরদিন প্রথম সূর্যের আলোয় রাশাদ রাহা জ্যোতির্ময় দাদুর সঙ্গে দেখা করল।

জ্যোর্তিময় দাদু এরকম অপরিচিত জায়গায় রাশাদ রাহাকে দেখে আন্তরিকভাবেই খুশি হলেন। কটেজের সামনের সমুদ্রের হাওয়ায় টি টেবিলে বসে ধোঁয়া-ওঠা গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, 'এতদিন দুষ্কৃতকারীর পিছু ধাওয়া করে গোয়েন্দা আসে বলে জানতাম, এখন দেখছি গোয়েন্দার পিছু ধাওয়া করেও গোয়েন্দা আসে। হা হা হা।'

রাশাদ রাহা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'নিরুপায় হয়ে এসেছি দাদু। আপনি

ছাড়া এই কেসের সমাধা কেউ দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না।'

'ঘটনাটা ঘটেছে রিটায়ার্ড কর্নেলের ওয়াহেদ মির্জার গাজীপুরের বাংলো বাড়িতে। রাতে বিশিষ্ট অতিথিদের ডিনারের দাওয়াত ছিল। সন্ধ্যের পর থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে ঢাকা থেকে একে একে অতিথিরা হাজির হয়েছেন। বিপত্নীক কর্নেলের খাস খানসামা রইস সবদিকেই সামাল দিচ্ছে। কুক, বেয়ারা সব মিলিয়ে অতিথিদের খেদামতের লোকের অভাব নেই।

অতিথিরা সবাই কর্নেলের খাস কামরায় আড্ডা দিচ্ছেন। খাস কামরা বললেও ওটা যেন অনেকটা সমরাস্ত্র প্রদর্শনীর ঘর। দেয়ালে তরবারি, ছোরা, কৃপাণ, ভোজালি ইত্যাদি নানা অস্ত্র লটকানো আছে। বনেদি বাগানবাড়ির চারপাশে উঁচু পাঁচিল। বাগানবাড়িতে ঢোকার একটাই লোহার দরজা। দরজায় ষণ্ডামার্কা দারোয়ান রমজানের চোখ এড়িয়ে কেউ ভেতরে ঢুকতে পারে না।

কর্নেলের অতিথিরাও বেশ অভিজাত। তার মধ্যে নামকরা বেশ কয়েকজন আছেন। আছেন কর্নেলের তিন বিশিষ্ট বন্ধু। পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসলাম হক, বেশ সুটেড-বুটেড হয়েই এসেছেন তিনি। কোমরে গোঁজা লাইসেন্স করা পিস্তল। পিস্তল সঙ্গে আনার একটা গোপন উদ্দেশ্য তার আছে। তার সঙ্গে আছে খেতাবধারী তলোয়ারবিদ খাজা নঈমুদ্দীন, যিনি তলোয়ার চালানোয় বিশেষ পারদর্শী। আজ রাতে বন্ধুদের তলোয়ার চালানো শেখানোর মানসে খাপে মোড়া তলোয়ার তার সঙ্গেই। রয়েছেন অপরাধবিজ্ঞানী প্রফেসর আলিম। অপরাধবিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পারদর্শী বলে তিনি দড়ির কাজ নিয়ে সম্প্রতি গবেষণা করছেন। ডান হাত দিয়ে দড়ি ধরে বাম হাতে গিট পাকিয়ে টেনে তিনি নানারকম নট আগত অতিথিদের শেখাচ্ছিলেন কীভাবে অপরাধীরা দড়ির ব্যবহার করে। স্বয়ং কর্নেল নিজেই তার বিভিন্ন মিশন থেকে উপহার পাওয়া ধারালো অস্ত্রপাতির বয়ান দিচ্ছিলেন অতিথিদের কাছে।

অতিথিরা সবাই এসে পড়লেও কর্নেল উন্মুখ হয়ে আছেন একজন বিশেষ অতিথিদের জন্য, যাকে দেখলে আগত তার তিন বন্ধু অবশ্যই চমকে উঠবে, বিস্মিত হবে।

বিশেষ অতিথিকে আজকে ডিনার পার্টিতে আমন্ত্রণের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কর্নেলের। ওকে দেখে তার তিন বন্ধুর মুখখানি কেমন হয় তা-ই দেখার ইচ্ছে কর্নেলের। কারণ ওর এই তিন বন্ধু এরকম একটা অপরাধ করেছিল, যার একমাত্র সাক্ষী ছিল এই বিশেষ বন্ধুটি। বন্ধুটি ঢাকা শহরে এসেছে, তা ওর তিন বন্ধুর কারোই জানার কথা নয়। জানলে ওদের সেই বন্ধুত্ব জীবনের অপরাধের একমাত্র রাজসাক্ষীকে ওরা কেউ ছেড়ে কথা কইবে না। কর্নেলের বিশেষ বন্ধুটিও জানে না, সেই তিন বন্ধু এখন এখানে আছে।

কর্নেল মজা দেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখনই হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল।

কর্নেল সমবেত সবাইকে বললেন, 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের নিজস্ব জেনারেটর আছে। জেনারেটরে ফুয়েল নেই। ফুয়েল ভরা হলেই আলো জ্বলে উঠবে।'

অন্ধকারের মধ্যে কে যেন একজন বলে উঠল, এখানে বসে থাকার চেয়ে বাগানের দিকটাতে ঘুরে আসি। বাগানবাড়িতে এসে ঘরে বসে থাকার কোনো মানেই হয় না।'

দেখা গেল ঘরে বসে থাকার ইচ্ছে তেমন কোনো অতিথিরই নেই। সবাইকে একে একে বাগানের দিকে যেতে দেখা গেল। ঘোর অন্ধকার হওয়ায় বাগানের কিছুই ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না। তার মধ্যেই হঠাৎ করে একটা আওয়াজ এবং তারপরে গুলির শব্দ ভেসে এল।

আর তক্ষুনি জেনারেটর চালু হয়ে বাগানের দিককার আলো জ্বলে উঠল। হতভম্ব সবাই দৌড়ে এসে দেখতে পেল বাগানে একটা রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। লাশের গলায় ফাঁসুড়ে দড়ি উপরের দিকে টানটান হয়ে আছে। আর ঠিক নিচেই নিখুঁতভাবে তলোয়ারের এক কোপে গলা ফাঁক হয়ে শরীরের সঙ্গে ঝুলছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, লাশের বুকের কাছে পিস্তলের গুলির দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

লাশের মুখে আলো পড়তেই কর্নেল আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন, লাশটা আর কারোর নয়, তার বিশিষ্ট বন্ধু বিশেষ অতিথি মুহিবুল আলমের!

কর্নেলের তিন বন্ধুই লাশের মুখ দেখে হতভম্ব হয়ে গেল, না হয় হতভম্ব হওয়ার ভাব করল। কর্নেল আগত অতিথিদের মধ্য থেকে ডাক্তার আর পুলিশ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানালেন, ব্যাপারটার সুরাহা করার জন্য। এবং তার ঘনিষ্ঠ তিন বন্ধুই যে নিজের অপরাধের রাজসাক্ষীকে সরিয়ে দেয়ার জন্যই এই অপকর্মটি করে থাকতে পারে, সেই সন্দেহের কথা জানালেন। পুলিশ কর্মকর্তা একটু অবাক হয়ে বলল, 'লাশের আগে পিস্তলের বুলেটের দাগ, ফাঁসের চিহ্ন, আর তলোয়ারের কোপ থাকলেও আমার মনে হয় তিনজন একসঙ্গে মানুষটাকে হত্যা করেনি। যেকোনো একজন মানুষটাকে হত্যা করেছে। বাকি দুজন অন্ধকারে না বুঝে প্রতিশোধ নেয়ার মানসে আক্রমণ চালিয়েছে। এখন ফরেনসিকের ডাক্তারই হয়তো এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারবেন।

লাশের পরীক্ষা করতে থাকা ডাক্তার লাশ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'ওনার কথাই ঠিক। একজনই ওনাকে হত্যা করেছে। বাকি দুজন মৃতদেহের ওপর আঘাত হেনেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে হত্যাকারী বাম হাতি। কারণ তার হত্যাকৌশলে স্পষ্টত বাম হাতের কাজ দেখা যাচ্ছে।'

কর্নেল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বললেন, 'ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছে কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

পুলিশের কর্মকর্তা বললেন, 'অনুমান করা যায়। আপনার কথা শুনেই বুঝতে পারছি আপনি যেরকম আপনার তিন বন্ধুকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য মুহিবুল আলমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তেমনি আপনার তিন বন্ধুও মুহিবুল আলমের এখানে আসার কথা জানত। হয়তো একজন জানত, অন্যদের জানিয়েছিল। মুহিবুল আলমও ভেবেছিল এতদিনে সব ধামাচাপা পড়ে যাওয়ায় হয়তো তার প্রতি কারোর আক্রোশ নেই। সেই সরল বিশ্বাসেই সে আপনার আমন্ত্রণে এখানে এসেছিল। এবং ওরা তিনজন যে আসবে তা ধারণা করলেও ভয়ের কিছু মনে করেনি। দুর্ভাগ্যবশত, মুহিবুল যখন এখানে এসে পৌছায় ঠিক সেই মুহূর্তে ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। সে দারোয়ানকে নিজের পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢোকে। দারোয়ানের সঙ্গে মুহিবের কথোপকথন তিন বন্ধুর কানে যায়। তারা যে যার মতো অন্ধকার বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে মুহিবকে আক্রমণ করে। একজন আক্রমণ করে মেরে গাছের গায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর বাকি দুজন গাছের গায়ে দাঁড়ানো লাশ দেখে জীবন্ত মানুষ ভেবে প্রতিশোধ তোলে। ঘটনাটা এরকমই হতে পারে। তবে একজন প্রকৃত খুনি হলেও বাকি দুজনও খুনের চেষ্টা করেছিল বলে তিনজনকেই অ্যারেস্ট করা হলো।'

'দাদু ঘটনাটা তো পুরোটা শুনলেন, এখন বলুন তো কে প্রথমে খুন করেছে, কীভাবে তা ডাক্তার বুঝতে পারল? তারপর কে কীভাবে খুন করেছে?'

জ্যোতির্ময় দাদু মুচকি হাসলেন। তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন।

পাঠক, আপনি কি ধরতে পেরেছেন? পারলে বলুন তো কে মুহিবুল আলমকে প্রথম খুন করেছে? কীভাবে? ডাক্তার কীভাবে তা বুঝতে পারলেন? তারপর কে কীভাবে খুন করেছে?

শেয়াল দেবতা রহস্য

সকালে জগিং শেষে গোয়েন্দা নাভিদ পত্রিকা টেনে নিয়ে বসল। সহকারী জুয়েল কিচেনে সকালের নাশতা বানানোয় ব্যস্ত। গোয়েন্দার সহকারী হিসেবে বেশিরভাগ সময় বেকার বসে থাকতে হয় বলে নাভিদ টাকা দিয়ে ওকে পাশে একটা ছোটখাটো স্টেশনারি দোকান করে দিয়েছে। জুয়েলকে এখন অধিকাংশ সময়ই দোকানে স্কুলের ছেলেমেয়ের কাছে খাতা-পেন্সিল রাবার এসবের কারবার করতে দেখা যায়। নাশতাটা বানিয়ে দিয়েই সে দোকানে যাবে। এখন স্কুলের সময়।

নাভিদ সকালের পত্রিকায় গোয়েন্দার নজরে পড়ার মতো কোনো খবর পাওয়া যায় কিনা দেখতে গেল। গতকালের খবরটা আজকে ছাপা হয়েছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিওলজি মানে প্রত্নতত্ত্বের এক নামি অধ্যাপক মুবাশ্বের করিমের অন্তর্ধানের খবর। পুলিশে বরাত দিয়ে পত্রিকাওয়ালারা জানিয়েছে, সর্বত্রই খোঁজ করা হয়েছে। বাহাত্তর ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এখনও তার সন্ধান মেলেনি। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, অধ্যাপক করিম এর আগেও কয়েকবার নিখোঁজ হয়েছেন। কাজের চাপ বেশি হয়ে গেলে, তিনি বাড়ির হট্টগোল থেকে বেরিয়ে যেতেন। সেক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই কোনো না কোনো ছাত্রের বাসায় চলে যেতেন। পরিবারের সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ বন্ধ রাখতেন। ছাত্ররাই তাকে পরবর্তী সময়ে বাড়িতে পৌঁছে দিত। কিন্তু এবারে তেমনটি হয়নি। কোনো ছাত্রের বাড়িতেই তিনি যাননি।

পুলিশের গাড়ি গেটের বাইরে দাঁড়াতেই জুয়েল সচকিত হলো। একটু উল্লসিত কণ্ঠেই বলল, 'ওস্তাদ, মনে হয় থানা থেকে আপনার ডাক পড়েছে।' গায়ে টি-শার্ট চাপাতে চাপাতে বলল, 'আমি কিন্তু ওসবের মধ্যে নেই। আজকে দোকানে অনেক চাপ থাকবে।'

'আগে আসুক না, দেখি কী ব্যাপার!' নাভিদ বিড়বিড় করে বলল,

'অধ্যাপকের ব্যাপারেই আসছে কিনা কে জানে!'

পুলিশ ইন্সপেক্টর সামিউল এসে প্রাথমিক সম্ভাষণ শেষে বলল, 'আপনি এক্ষুনি রেডি হয়ে নেন। আমার সঙ্গে যেতে হবে। একটা অন্তর্ধানের ব্যাপার!'

'অধ্যাপক মোবাশ্বের করিমের ব্যাপারেই কি!'

পুলিশ ইন্সপেক্টর একটু চমকালেও সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পুলিশি তদন্ত শেষ। এবার যদি আপনি একটু হেল্প করতে পারেন।'

গাড়িতে যেতে যেতেই পত্রিকায় পড়া খবরটা জানাল সামিউল। প্রত্নতত্ত্বের এই অধ্যাপকের এরকম বাড়ি-পালানো রোগ আগে থেকেই ছিল। তবে সেটা সংসারের ওপর বিরাগভাজন হয়েই। তখন তিনি ছাত্রদের বাসায় যেতেই পছন্দ করতেন।'

কথার মাঝখানেই নাভিদ জিজ্ঞেস করল, 'আর্কিওলজির গবেষণার জন্য বাইরে যেতেন না?'

'তা যেতেন। কিন্তু সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে এবং আরও অন্য অনেকের সঙ্গে। নানারকম খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতি নিয়ে, এরকম এক বস্ত্রে নয়।'

'অধ্যাপকের প্রিয় ছাত্রদের বাসায় খোঁজ নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তা থেকে ঠিক কোনো কিছু বের করতে পারিনি। ছাত্ররাও কোনো কিছু লুকাচ্ছে কিনা বুঝতে পারিনি। পারিনি বলেই আপনার সহায়তা চাচ্ছি।'

'সেক্ষেত্রে আমি হয়তো প্রফেসরের বাড়িতে না গিয়ে ছাত্রদের বাড়ি থেকেই শুরু করতে পারি।'

'সেটা আপনার ইচ্ছে।'

'তার আগে থানায় গিয়ে আমাকে কেসের ডিটেলসটা একটু দেখতে হবে।'

থানায় গিয়ে কাগজপত্র দেখল নাভিদ। কেসটা তেমন জটিল কিছু নয়। পরিবারের কাছ থেকে জানা গেছে, ফোনটোন বন্ধ রেখে অধ্যাপক করিমের বাড়ি থেকে চলে যাওয়া নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবারের মতো তিনদিন তিনি কখনও থাকেননি। আর সেই কারণেই তাদের উৎকণ্ঠা। বাড়ি থেকে এক বস্ত্রেই বেরিয়েছেন। গায়ে খদ্দরের ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি, তার উপরে কটি এবং পরনে পাজামা, পায়ে চপ্পল, এই তার বেশভুষা। ছাত্রদের কাছ থেকেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। শুধু রাহুল নামের এক ছাত্র পুলিশের কাছে জানিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে স্যার আনুবিস বা শেয়াল-দেবতার মূর্তি নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলেন। সেই ছাত্রের ধারণা, শেয়াল-দেবতা আনুবিসের মূর্তির সঙ্গে স্যারের এই অন্তর্ধানের কোনো রহস্য রয়েছে।

থানা থেকে বেরিয়েই নাভিদ প্রথমে প্রফেসরের ছাত্র রাহুলের বাসায় গেল। ছুটির দিন ভার্সিটি বন্ধ হওয়ায় রাহুল বাসাতেই ছিল। নাভিদকে আপ্যায়ন করে রাহুল জানাল, 'গত কয়েকদিন যাবৎ স্যার মিসরীয় শেয়াল-দেবতা আনুবিস নিয়ে বেশ উত্তেজিত ছিলেন। এমনকি ক্লাসে এই বিষয়টি নিয়ে উনি পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে বলছিলেন, শেয়াল দেবতার মূর্তি আমাদের দেশেও কয়েকটা আছে। কিন্তু লোকজনের অজ্ঞতার কারণে তা বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরে অবহেলায় পড়ে আছে। এসব শেয়াল দেবতার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে, সেটা ধরে এগুতে পারলেই হবে। এর বেশি কিছু আর তিনি বলেননি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, স্যার হয়তো সেই শেয়াল দেবতার পেছনে ছুটতেই নিরুদ্দেশ হয়েছেন।'

নাভিদ জিজ্ঞেস করল, 'শেয়াল দেবতার ক্লাসের পরে স্যারের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছিল?'

'জি না। উনি আর ক্লাসেই আসেননি।'

রাহুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং স্যারের প্রিয় ছাত্র পলাশের হোস্টেলে চলে এলো নাভিদ। পড়ুয়া পলাশ তখন ক্যাম্পাসের লাইব্রেরিতে ছিল। লাইব্রেরির বারান্দাতেই কথা হলো দুজনার।

'স্যার কখনও আমার হোস্টেলে আসেননি। তবে মাঝেমধ্যে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার দরকার হলে আমাকে ডেকে নিয়ে এই লাইব্রেরিতে বসতেন।'

'সম্প্রতি কী নিয়ে কাজ করছিলেন কিছু জানেন?'

'কী একটা ইঁদুর-বেড়ালের মূর্তি নিয়ে জানি খোঁজখবর করছিলেন। স্যারের পাঞ্জাবির পকেটেই থাকত হাতের মুঠোর সাইজের মূর্তিটা। একদিন দেখিয়েছিল ইঁদুর, বিড়াল না ব্যাঙ না শেয়াল ঠিক বুঝতে পারিনি। আসলে ওসব মূর্তিটুর্তি নিয়ে আমার তেমন কোনো আগ্রহ নেই কিনা, তাই!'

নাভিদ ওখান থেকে চলে এল রাজনের বাসায়। রাজনকে ফোনে বাসায়ই দেখা করার কথা জানিয়েছিল। রাজনও প্রায় একই রকম কথা বলল, শুধু মূর্তির ব্যাপারটাতে একটু অন্যরকম বলল। সে স্পষ্টত বলল, ওটা মিসরীয় শেয়াল দেবতা বা আনুবিস নয়, ওটা আমাদের এখানকারই মূর্তি। মিসরীয় দেবদেবীর মধ্যে বিড়াল থাকলেও আমাদের এখানে তো আর নয়। প্রাচীন ইজিপশিয়ান দেবদেবীর মধ্যে বেড়ালের স্থান বেশ উঁচুতে। ওখানে বিড়ালকে পুজো করা হয়। আমাদের দেশেও হিন্দুরা বিড়ালকে ষষ্টির বাহন হিসেবে খাতির করে। এর বেশি কিছু নয়। আমরা বেড়াল পুষি, কিন্তু তার পুজো করি না।'

'আপনি শিওর মূর্তিটা বেড়াল ছিল, শেয়াল দেবতা নয়?'

'জি, আমি নিজে হাতে নিয়ে ওটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছি। স্যারের ধারণা

ছিল ওটা যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে আনুবিস বা শেয়াল দেবতাও পাওয়া যাবে। স্যার এই নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলেন। আমার ধারণা, স্যার শেয়াল দেবতার সন্ধানেই বেরিয়েছেন। শেয়াল দেবতা পেলে ঠিকই ফিরে আসবেন। এবার আর প্রত্নগবেষণার দাবিদার অন্য কাউকে করবেন না বলে আমাদের কাউকে জানাননি।'

নাভিদ বুঝল, অধ্যাপক করিমের প্রিয় ছাত্র প্রত্নগবেষণার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কাছ থেকে আর তেমন কোনো তথ্য পাওয়ার নেই। এমনকি ছাত্রদের মতো তারও ধারণা, অধ্যাপক করিম স্বেচ্ছায় অন্তর্ধান হয়ে আছেন, প্রত্ন আবিষ্কার করে সবাইকে চমকে দিয়ে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তখনও একজন ছাত্রের সঙ্গে তার দেখা করা বাকি। শফিক হাসান এই ডিপার্টমেন্টে স্যারের আরেক প্রিয় ছাত্র। স্যার নিখোঁজ হয়ে মাঝে মাঝে এর বাসায়ও থাকতেন।

শফিক হাসান বাইরে বেরুনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। নাভিদের ফোন পেয়ে ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করতে লাগল। নাভিদ আসতেই বেশ ভারিক্কি চালে বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি সারতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি বাইরে বেরুচ্ছিলাম।'

নাভিদ একটু খোঁচা দিয়ে বলল, 'কারো সঙ্গে দেখা করার তাড়া আছে বুঝি?'

শফিক খোঁচাটা গায়ে না মেখেই বলল, 'হ্যাঁ। এমন একজনের সঙ্গে দেখা করার তাড়া আছে। তাড়া যাদের আছে তারাই বোঝে! প্রেমিকার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলাম, আপনার প্রফেসরের সঙ্গে নয়! স্যারের কোনো খবর আমি জানি না।'

'খবর বের করার দায়িত্ব আমাদের। আপনার জানা জিনিসটা শুধু আমাদের জানাবেন। যা জানেন বলে দিলেই তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন।'

শফিক বেশ গুছিয়েই বলল, 'স্যার প্রত্নগবেষণায় একটা বেড়ালের মূর্তি পেয়েছিলেন। স্যারের ধারণা, ওটা ইজিপশিয়ান বেড়াল দেবতা আখনাটানের মূর্তি। মূর্তিটা আমরা সবাই দেখেছি। বিশেষত স্যারের বিশেষ প্রিয়পাত্র, রাহুল, পলাশ, রাজন আর আমি। মূর্তিটা পাওয়ার পর থেকেই স্যারের ধারণা জন্মেছে যেখানে বেড়াল দেবতা ছিল, ওখানে মিসরীয় শেয়াল দেবতা আছে। এই উপমহাদেশে মিসরীয় দেবতারা কীভাবে আসবে? ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে। কিন্তু স্যারের আত্মবিশ্বাস দেখে আমরা কেউ 'না' করিনি। তবে বিড়ালের মূর্তিটা কোথায় পাওয়া গিয়েছিল তা স্যার আমাদের জানাননি। সবার সামনে জানাননি। বিশেষ কাউকে বলে থাকলে বলতে পারব না। স্যার আমার বাসায় আসেননি, যোগাযোগও হয়নি। আপনি প্রয়োজনে আমার কললিস্ট চেক করতে পারেন।'

'তার আর দরকার হবে না। আপনার স্যারের অন্তর্ধানের সঙ্গে কে জড়িত এবং তাকে রিমান্ডে নিলেই আপনার স্যার কোথায় আছে বেরিয়ে আসবে।' নাভিদ সরাসরি থানায় চলে এল। চারজন ছাত্রের মধ্যে একজনের ওপর সাদা পোশাকে পুলিশি নজরদারি রাখতে বলল। নিজেও থাকল সেই নজরদারিতে। সেই ছাত্রের গতিবিধি থেকেই বের করে ফেলল প্রফেসরকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে।

পাঠক বলুন তো, কে প্রফেসরের অন্তর্ধানের জন্য দায়ী? গোয়েন্দা নাভিদ কীভাবে তা বুঝতে পারল?

ডিটেকটিভ হেকিম হোমস

গরমের ছুটিতে ওদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। জ্যৈষ্ঠের তাপদাহ এত প্রবল যে বাইরে গিয়ে আম কুড়াবে সে ইচ্ছেও ওদের মনে জেগে ওঠে না। প্রথম সাময়িক পরীক্ষা হয়ে যাওয়ায় পড়ার চাপও কিছুটা কম। শুয়ে-বসে থেকে সময় কাটে না। দুপুরের পরের সময়টাই অলস সময়। বড়রা সব পড়ে পড়ে ঘুমায়। বেশি ছোটরা লুডু, বাঘবন্দী এসব খেলে। ওদের হয়েছে ঝামেলা। না খেলতে পারছে বাইরে গিয়ে ফুটবল-ক্রিকেট, ছোটদের মতো না খেলতে পারছে লুডু। ক্যারামবোর্ড একটা আছে, কিন্তু খেলার ঠকাস ঠকাস শব্দে বড়দের ঘুম ভেঙে যায় বলে ওটা নিষিদ্ধ। শেষ ভরসা মুনশি দাদু ও তার গল্পের ঝাঁপি।

ওরা সবাই দাদুর পেছনে গোয়েন্দাগিরি করে। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে মুনশি দাদু এখনও ঘুমের আয়োজন করেনি দেখে এই মওকা কাজে লাগানোর চেষ্টা করল। সবাই মিলে দাদুকে পাকড়াও করল, 'দাদু, এখন ভাতঘুম দিলে হবে না। আমাদের একটা গল্প শোনাতে হবে।'

ফজু বলল, 'তোমার জীবনের গল্প। বানানো গল্প নয়।'

মুনশি দাদু একটা কপট ভঙ্গিমা করে বলল, 'আমি কোনো বানানো গল্প বলি না। নিজের জীবনের গল্পই বলি। আমার জীবন এত বর্ণাঢ্য আর বিচিত্র যে সেই গল্প তোদের কাছে বানানো গল্পের মতো শোনায়।'

ডিটু বলল, 'ঠিক আছে দাদু। তোমার জীবনের গল্পই বলো। আমি তোমার জন্য পান নিয়ে আসি।'

'শুধু পান নয়, তালপাতার হাতপাখা। কারেন্টের কোনো ঠিক নেই। কখন যায় কখন আসে। গল্প বলার সময় পালাক্রমে পাখা দিয়ে বাতাস করবি।'

ঠান্ডা পানি, খিলি পান আর পাখা নিয়ে আয়োজন করে বসলাম হেকিম মুনশি দাদুর মুখ থেকে গল্প শুনতে।

দাদু বেশ আয়োজন করে বসে মুখের খিলিপান শেষ করে ঠান্ডা পানি খেয়ে

গল্প শুরু করলেন।

'তোরা তো জানিসই আমার জীবন কত বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য। জীবনের প্রয়োজনে হেন কাজ নেই তা করেনি। একবার কোনো পেশায় সুবিধে করতে না পেরে শখের গোয়েন্দাগিরিতে নাম লেখালাম। গোয়েন্দা হিসেবে আমার নাম কি ছিল জানিস?'

'না বললে জানব কী করে?' ফটিক ফচকে স্বরে বলল।

'বিখ্যাত গোয়েন্দা হেকিম হোমস। শার্লক হোমসের সঙ্গে মিলিয়ে রাখলেও আমার ওই হোমের অর্থ ছিল ঘরোয়া গোয়েন্দাগিরি। অর্থাৎ যেসব কেসে লোকজন থানা-পুলিশ করার চেয়ে হাতের কাছের একজন গোয়েন্দার শরণাপন্ন হতে পছন্দ করে। ধর, কারোর ঘর থেকে একজোড়া কানের দুল হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেল, কারোর পোষা কুকুর, ময়না অথবা কাজের লোক হারিয়ে গেল, তখনই আমার ডাক পড়ে, অর্থাৎ ঘরের মানুষ। ঘরজামাইয়ের মতো ঘরের গোয়েন্দা।'

ম্যাকু একটা খুক খুক করে হাসির মতো করে কেশে উঠলেও আমরা কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে ওকে চুপ করলাম, হোক না ঘরের গোয়েন্দা, গোয়েন্দা তো!

'তখনই একটা কেস হাতে এল। অপহরণ কেস। সাড়ে সাত বছরের চালাক চতুর ম্যাকগাইভার কিয়ের মালিক মন্টু কিডন্যাপ হয়েছে। আমার ডাক পড়তেই গেলাম মন্টুদের বাড়ি। অপহরণের আগে মন্টুর বাবা-মা একটু ঝামেলায় ছিল। ঝামেলাটা হচ্ছে ওর বাবা-মা ডিভোর্সের প্রস্তুতিস্বরূপ আলাদা থাকতে শুরু করে। মন্টু এক সপ্তাহ ওর বাবার কাছে আরেক সপ্তাহ ওর মায়ের কাছে থাকত। ছেলের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে না বলেই ওর মা ওর বাবার অ্যাপার্টমেন্টের কাছে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকত। বাবা ও মায়ের অ্যাপার্টমেন্টের মাঝখানে শুধু একটা মাঠ ছিল। ওখানে ছোটরা বড়রা সবাই খেলত। মন্টুও ওর আয়ার সঙ্গে প্রতিদিন বিকেলে মাঠে খেলতে আসত। আয়া নাসরিনই মন্টুকে ওর মা-বাবার কাছে আনা-নেয়া করত।

অপহরণের ঘটনা ঘটল মাঠ থেকেই। মন্টু এই সপ্তাহে বাবার কাছেই ছিল। বাবার বাসা থেকে আয়া নাসরিন ওকে নিয়ে মাঠে এসেছিল। তারপর মন্টুকে মাঠে খেলতে দিয়ে নাসরিন মোবাইল ফোনে যেন কার সঙ্গে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হতেই দেখে, মন্টু মাঠে নেই। তারপর খোঁজ খোঁজ করেও আর মন্টুকে কোথাও পাওয়া গেল না। ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর মন্টুর বাবা মা একত্রিত হয়ে থানায় খবর দিল। মন্টুর বাবার সঙ্গে আমার আগের থেকে পরিচয় ছিল। পুলিশকে জানানোর পাশাপাশি উনি আমারও শরণাপন্ন হলেন।

পরদিন সকালে মন্টুর বাবার কাছে মুক্তিপণের চিঠি এল। আমার অনুরোধে

পুলিশ খামসহ চিঠিটা আমার হাতে দিলেন। মুক্তিপণের চিঠিভরা খামটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলাম। খামটা সরকারি ডাক বিভাগের খাম নয়, অফিসিয়াল খাম। খামের নিচে অফিসের লোগো দেয়া আছে। অফিসটা আমি চিনি। আমাদের পরিচিত কেউ কেউ ওই অফিসে চাকরি করে। আমি খামটা মন্টুর বাবা-মায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'দেখুন তো, এই খামটা আমাদের কারোর চেনা কিনা?'

খামটা হাতে নিয়েই মন্টুর মা স্বামীর দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য লুকিয়ে রেখেছ। ছেলেকে মায়ের কাছে থেকে দূরে সরানোর জন্য অপহরণ করেছ। তুমি অপহরণকারী।' ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে তেড়ে গেলেন।

খামটা দেখে মন্টুর বাবাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। সত্যিই তো, খামটা তারই। আমি ভদ্রমহিলাকে শান্ত করে খাম খুলে চিঠিটা বের করলাম। খামের ভেতরে দামি গোলাপি রঙের কাগজের প্যাডে চিঠিটা খেলা। লেখা বললে ভুল হবে, পেপার কাটিং। এবং অক্ষরগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো পত্রিকা।

'ছোট্ট বালকটি ফেরত পেতে চাইল পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিতে হবে। ছেলের বাবাকে একা গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে। গাড়ি চালিয়ে যেতে হবে জৈনাবাজার বড় তেঁতুলগাছের নিচে। বেলা ঠিক সোয়া এগারোটায় প্লাস্টিক প্যাকেট ব্যান্ডেল মোড়া টাকাটা গাছের নিচে ফেলে যেতে হবে। না হলে বালকটি...'

'মন্টুর বাবা চিঠিটা হাতে নিয়ে রোষকষায়ি নয়নে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি নিজেই মন্টুকে লুকিয়ে রেখে এখন আমাকে দোষ দিচ্ছ। তুমি হলফ করে বলতে পারবে, এই প্যাড তোমার নয়! এটা আমিই তোমাকে বিদেশ থেকে এনে দিয়েছিলাম। এই প্যাড এই দেশে পাওয়া যায় না।'

মন্টুর মা চুপসে গেল। বিড়বিড় করে বলল, 'প্যাডটা তো আমারই। কিন্তু ওটা চিঠির মধ্যে গেল কী করে!' তারপর জোরে জোরেই বলল, 'আমি এত বোকা নই যে নিজের নোট লেখা কাগজে এই চিঠি লিখব। আর এই পত্রিকার কাটিংগুলো দিয়ে লেখা দেখ। এই পত্রিকাটা তুমি বাসায় রাখ।'

মন্টুর বাবাও বিব্রত স্বরে বললেন, 'তাহলে তুমি ভাবলে কী করে আমি আমার নিজের খাম দিয়ে নিজের পত্রিকা দিয়ে এই কাজ করব?'

'সত্যিই তো, তোমার খাম তুমি এই কাজে ব্যবহার করবে, ঘরের পত্রিকা কাজে লাগাবে, আমার প্যাড দিয়েই আমি তোমার পত্রিকার অক্ষর দিয়ে চিঠি লিখব এই আমি ভাবতেই পারি না। কোথায় কোনো গোলমাল হচ্ছে। মনে হয় কেউ স্যাবোটাজ করে আমাদের দুজনকেই ঝামেলায় ফেলতে

চায়। আর সেই ঝামেলার বলি হচ্ছে আমাদের প্রিয় সন্তান মন্টু।'

আমি ওদের দুজনকেই থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আসল ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদের কারোর চোখে পড়েনি, এমনকি পুলিশেরও না। কিন্তু আমার মতো ঘরোয়া গোয়েন্দার চোখ ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। চিঠিটা সকাল দশটায় বাড়ির ডাকবক্সে পাওয়া গেছে। কোনো ডাকঘরের সিল-ছাপ্পর নেই। মানে হাতে হাতে ডাকবাক্সে ফেলে দেয়া। চিঠিতে বলা হয়েছে, বেলা ঠিক সোয়া এগারোটায় জায়গাটায় পৌঁছাতে। আপনারা আমরা সবাই ওই এলাকাটা চিনি। এবং ভালো করেই জানি, সকালে চিঠি পেয়ে বেলা ১১টায় দুই ঘণ্টার মধ্যে কোনোমতেই ওই জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। কারণ ওই শহরে পৌঁছতে অন্ততপক্ষে চার ঘণ্টা লাগবে। তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে?'

'পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, 'তার মানে মুক্তিপণের ব্যাপারটা ভুয়া।'

'মোটেই না। মুক্তিপণ ও অপহরণ কোনোটাই ভুয়া নয়, যদি না তা সাজানো হয়!' আমি একটু বিরতি দিয়ে বললাম, 'মুক্তিপণের পেপার কাটিংগুলো লক্ষ্য করেছেন, কখনও ছেলেটি কখনও বালক, শব্দগুলো পরিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ যে শব্দগুলো কেটেছে সে যুতসই আকারে পায়নি। কিন্তু শেষের দিকে সব ঠিকঠাক। এমনকি লাইনগুলো হুবহু তুলে দেয়া...

আমার কথা শেষ না করতে দিয়েই পুলিশ বলে উঠল, 'ঠিকই ধরেছেন, এরকম একটা মুক্তিপণের কেস আমরা কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি। পত্রিকাও এসেছিল। ওটা অন্য রেঞ্জের থানার কেস।'

'হু। তার মানে, ওখানকার পেপার কাটিংই তুলে দেয়া হয়েছে। আর যে এই কাজটা করেছে সেই অপহরণকারীর দুইটা জায়গা এবং তার পথের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই।'

সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পুলিশ বিরক্ত স্বরে বলল, 'তা থেকে কি প্রমাণিত হয়?'

আমি সবাইকে চমকে দিয়ে বললাম, 'আমাদের মন্টু অপহৃত হয়ে এখন কোথায় আছে আমি জানি এবং কে তাকে অপহরণ করেছে তাও জানি।'

আমার দেয়া তথ্যমতে মন্টুকে খুঁজে পাওয়া গেল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, মন্টুর এই অপহরণের মধ্যে দিয়ে মন্টুর বাবা-মায়ের মিল হয়ে গেল। তারা আবার একত্রে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

'এখন তোরা বল তো, মন্টু অপহরণের মূল রহস্য কী? আমি তা কীভাবে ধরতে পারলাম?' মুনশি দাদু আমাদেরকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে মুখে একটা খিলিপান পুরে দিয়ে মনের সুখে চিবাতে লাগলেন।

অদ্ভুত গোলমাল

সকালে ঘুম থেকে উঠেই জুয়েল বুঝতে পারল গোয়েন্দা নাভিদ ভাই কিছু একটা নিয়ে অস্থির হয়ে আছেন। সেই অস্থিরতা বারান্দায় চটি পায়ে ফটফট হাঁটাচলার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। জুয়েল নিঃশব্দে উঠে কিচেনে গেল সকালের নাশতা রেডি করতে।

নাশতার টেবিলে নাভিদ বসতেই জুয়েল রুটি আর ডিম পোচ দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কোনো কিছু নিয়ে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে নাকি ভাই?'

'হুমমম!' নাভিদ গম্ভীর স্বরে উত্তর বলল, তারপর নাশতায় মনোযোগী হলো। এরকম সময়ে নাভিদের ঘরে তার মোবাইল বেজে উঠল। নাভিদ নাশতার টেবিল থেকেই বলল, 'রিসিভ করে নিয়ে আয়। থানা থেকে ফোন এসেছে। এক্ষুনি বের হতে হবে।'

নাভিদ থানার কর্তব্যরত অফিসারের সঙ্গে কথা বলে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিল।

'একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েই সকাল থেকে বেশ উত্তেজিত ছিলাম। জানতাম, থানা থেকে ফোন আসবে। কিন্তু এখন আমরা থানায় নয়, স্পটেই যাব।'

'রহস্যটি কী ভাই?' জুয়েল জানতে চাইল।

'আত্মহত্যা, হার্ট অ্যাটাক নাকি জলজ্যান্ত মার্ডার তারই কুলকিনারা হচ্ছে না, এটাই রহস্য।'

জুয়েলকে মোটরবাইকের পেছনে নিয়ে নাভিদ বেরিয়ে পড়ল। থানা থেকেই জানিয়েছে স্পটে যাওয়ার কথা। নাভিদও ওই অভিজাত কলোনিটা চেনে। যেতে যেতে নাভিদ বলল, 'ঘটনাটা ঘটেছে ইলিশিয়াম কলোনিতে। কলোনির অভিজাত ব্যবসায়ী দাউদ মার্চেন্টের বাড়িতেই। মার্চেন্টদের গেস্টকে তাদের কাজের লোক খুন করেছে, অথবা লোকটা আত্মহত্যা করেছে।'

'তুমি না বললে হার্ট অ্যাটাক? তাহলে আবার মার্ডার আসছে কীভাবে?'

'সেটাই তো সন্দেহের কারণ। সার্ভেন্ট যদি নির্দোষই হবে, তাহলে মনিব মরার সঙ্গে সঙ্গে মনিবের ব্যাগ নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যাবে কেন?'

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নাভিদ সহকারী জুয়েলকে নিয়ে ইলিশিয়াম অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেল। অভিজাত এলাকা হওয়ায় কৌতূহলী জনতার তেমন কোনো ভিড় নেই।

ফ্ল্যাটের ভেতরে ঢুকে পরিস্থিতির আঁচ পাওয়া গেল। মৃত শরীফ মার্চেন্ট দাউদ মার্চেন্টের সম্পর্কের ভাই হন। চট্টগ্রাম থেকে ব্যবসার কাজে মাঝে মধ্যে ঢাকায় এলে ভাইয়ের এখানেই ওঠেন। ভাই বেঁচে না থাকলেও ভাইয়ের দুই সন্তান মুসা আর ইসা তাদের চাচাকে বেশ ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। তাছাড়া শরীফ মার্চেন্টের পরিচর্যার জন্য সঙ্গে সঙ্গে হায়দার আলী নামে আত্মীয়-কাম-সার্ভেন্ট থাকত। সে-ই শরীফ মার্চেন্টের সুস্থতা অসুস্থতায় দেখভাল করত।

নাভিদ পুলিশের ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিল। ডাক্তার জানালেন, 'আপাতদৃষ্টিতে হার্ট অ্যাটাকই মনে হচ্ছে। প্রাথমিক সুরতহালে সেটাই এসেছে। তবে অধিকতর ল্যাব টেস্টে অন্য কিছু বেরিয়ে এলে অবাক হব না।'

'এরকম সন্দেহের কোনো কারণ আছে কী?'

'ধরুন, শরীফ সাহেবের হার্টের অসুখের কারণে নিয়মিত হার্টের ওষুধ খেতে হতো। দিত কে? তার সার্ভেন্ট। কিন্তু সার্ভেন্ট যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় হার্টের ওষুধ না দিয়ে প্লাসিবো বা ভুল কোনো ওষুধ দিয়ে থাকে তাহলে তো লোকটা হার্ট অ্যাটাকেই মারা যাবে।'

'সার্ভেন্টের মারার মোটিভ কী থাকতে পারে?' এবারের প্রশ্নটা ডাক্তারকে নয়, পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তাকেই।

'প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, টাকা-পয়সা হাতানোটাই সিম্পল মোটিভ। যতদূর জানতে পেরেছি, শরীফ মার্চেন্ট চট্টগ্রাম থেকে ব্যবসার কাজে ঢাকায় আসার সময় ব্রিফকেস ভর্তি করে ক্যাশ টাকা এনেছিলেন। পঞ্চাশ লাখ টাকার একটা ব্যবসায়িক ডিল ছিল, কাজেই ব্রিফকেসে পঞ্চাশ লাখ টাকা ছিল এটা অনুমেয়। এখন শরীফ সাহেব মারা যাওয়ার সময় থেকেই তার সার্ভেন্ট আর টাকাভর্তি ব্রিফকেস মিসিং।'

নাভিদ জুয়েলকে ডেকে বলল, 'আমি শরীফ মার্চেন্টের থাকার গেস্টরুমটা ঘুরে দেখছি, তুই ফ্ল্যাটের সব দিকটা ঘুরে ঘুরে দেখে আয়। কেউ কিছুতে বাধা দিলে বলবি আমি সহকারী গোয়েন্দা।'

'ওইটা আমার ওপর ছেড়ে দেন ভাই, আমার এন্ট্রি আমি ঠিকই করে নিতে পারব।'

নাভিদ পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা, শরীফ মার্চেন্টের দুই ভ্রাতৃষ্পুত্র মুসা আর ইসার কাছ থেকে যেসব তথ্য পেল তাতে ঘটনাটা স্রেফ হার্ট অ্যাটাকই মনে হচ্ছে। এবং এই হার্ট অ্যাটাকের সুযোগ নিয়েই শরীফ মার্চেন্টের সার্ভেন্ট মার্চেন্টের কাছ থেকে টাকাভর্তি ব্রিফকেস নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। এখন সেই সার্ভেন্টকে ধরতে পারলে ঘটনার বাকি সত্যতাটুকু প্রকাশ পাবে।

পুলিশ কর্মকর্তা জানাল, সার্ভেন্টকে ধরার জন্য সর্বত্র তল্লাশি চালানো হচ্ছে, এমনকি হাইওয়ে পুলিশকেও লোকটার ছবি দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

জুয়েল ফিরে এসে নাভিদের কাছে বলল, 'বড়লোকদের কাজকারবারই আলাদা।'

'কেন? কী হয়েছে? কী দেখেছিস?'

'কী আর দেখব? বড়লোকদের সবই বড় বড়। বিশাল সাইজের দেয়ালজোড়া টিভি। ছোটখাটো একটা খাটের মতো বিশাল ফ্রিজার। অন্তত দুজন মানুষ ওর মধ্যে ভালোভাবে শুয়ে থাকতে পারবে এত বড়। একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারও লুকিয়ে থাকলে অবাক হব না।'

'হুমম। বড়লোকেরা ওভাবেই টাকা বাঁচিয়ে বড়লোক হয়। মাছ মাংস বা ফ্রোজেন খাবার সস্তায় পেলে একবারে কিনে ফ্রিজারে ঢুকিয়ে ফেলে, তারপর মাসের পর মাস ধরে খায়।'

'ছ্যা ছ্যা, ওই খাবারে কোনো টেস্ট পাওয়া যায়?'

'যাক আর না যাক সাশ্রয়টাই বড় কথা। ওভাবেই একটু একটু করে বাঁচিয়ে বড়লোক হতে হয়। তা ফ্রিজারে মাছ মাংস কি আছে কি দেখলি?'

'কিচ্ছু নেই। একেবারে ফাঁকা। তবে ফ্রিজটা চালু আছে দেখলাম।'

আপাতত তেমন কিছু করার নেই ভেবেই জুয়েলকে নিয়ে থানায় চলে এলো নাভিদ। এখন সার্ভেন্টের হদিস বের করা না গেলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

'ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত।' জুয়েল বাসায় ফিরতে ফিরতে বলল, 'একজনের এরকম হঠাৎ করে হাওয়া হয়ে যাওয়া।'

'হাওয়া হয়ে যাবে কেন?' নাভিদ বলল, 'নিশ্চয় কারোর বাড়িতে অথবা কোনো হোটেলে গিয়ে উঠেছে। লোকটার তো আর টাকার অভাব নেই।'

'যেখানেই থাকুক, পুলিশের নজর এড়িয়ে বেশিদিন টিকতে পারবে না। তাছাড়া টাকাটা খরচ করতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে।'

সেদিন দুপুরের পরেই জুয়েল বাইরের থেকে ভরপেট খেয়ে বাসায় এল। মুখে তৃপ্তির ছাপ। প্রশংসা করতে করতে বলল, 'বড়লোকদের কাজ-কারবারই আলাদা। চাচা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফকির-মিসকিনদের

খাইয়ে দিয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়ে জোর করে বসিয়ে দিল। যদিও দুর্মুখরা বলাবলি করছিল, ফ্রিজের খাবার পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে গরিব-মিসকিনদের রেঁধে খাইয়ে ঝামেলা চুকিয়েছে।'

নাভিদ সচকিত হলো। সে ভ্রু কুঁচকে বলল, 'তোর কথাটা ঠিক বুঝলাম না। কী খাবার?'

'আমি বলিনি। কয়েকজন বলাবলি করছিল। ফ্রিজের মাছ মাংস সবজি দিয়েই নাকি আজকের ফকির মিসকিনদের খাইয়েছে। ডিপ ফ্রিজ পুরোটাই খালি করে পাঠিয়েছে।'

জুয়েলের কথা শেষ হতে না হতেই নাভিদ বলল, 'চল, এক্ষুনি থানা হয়ে একবার দাউদ মার্চেন্টের বাড়িতে যেতে হবে, না হলে লাশ এতক্ষণে অন্যত্র পাচার হয়ে যাবে?'

'কার লাশ?'

'শরীফ মার্চেন্টের সার্ভেন্ট হায়দার আলীর লাশ।'

'মানে আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না ভাই।' জুয়েল বলল।

নাভিদ আর কোনো কথা না বলে থানায় চলে এলো। কর্তব্যরত অফিসারের সঙ্গে কথা বলে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে চলে এল ইলিশিয়ামে দাউদ মার্চেন্টের অ্যাপার্টমেন্টে।

ইসা-মুসা দুই ভাইই বাড়িতে ছিল। ওরা জানাল, 'দিনতিনেক আগে শরীফ চাচা হায়দার চাচাকে সঙ্গে করে ব্যবসার কাজে আমাদের বাড়িতে আসে। যথারীতি চাচা চাচার রুমে ওঠে। চাচার সঙ্গে হায়দার চাচাও চাচার দেখভালের জন্য ওই রুমটাতে থাকে। চাচার হার্টের সমস্যা ছিল আমরা আগে থেকেই জানতাম। যে কারণে হায়দার চাচা চাচার সঙ্গে থাকায় আমরা অন্যরকম কিছু দেখিনি। ঘটনার দিন সন্ধ্যেয় চাচার বুকের ব্যথা ওঠে। তখন হায়দার চাচাও ওখানে ছিল। আমরা আমাদের পারিবারিক ডাক্তারকে খবর দিয়ে আনাই। তিনি এসে জানান, শরীফ চাচা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।'

'তখন হায়দার আলী কোথায় ছিলেন?'

'ডাক্তার থাকাকালীন আমরা ওনাকে চাচার রুমেই দেখেছিলাম। তারপর সবাই চাচাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকায় উনি কোথায় তা আর খেয়াল করিনি।'

'শরীফ সাহেবের টাকা ভর্তি ব্রিফকেসটা কোথায় ছিল তাও কি খেয়াল করেছিলেন?'

'না। চাচার ব্রিফকেস ভর্তি যে টাকা আছে তা আমরা জানতাম না। হায়দার চাচা জানতেন, কারণ উনিই সব ডিল করতেন।'

নাভিদ রুমের চারিদিকে তাকাল। তারপর পুলিশ কর্মকর্তার দিকে ইশারা

হত্যারহস্য

রাশাদ রাহা বুঝতে পারছে, জ্যোতির্ময় দাদুর কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সে নিজে এই হত্যারহস্যের কোনো কূলকিনারা করতে পারছে না। এদিকে অফিস থেকে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের টাইম লাইন বেঁধে দেয়া হয়ে গেছে।

জ্যোতির্ময় দাদু মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। বলেন, অযথা উৎপাত। তবে তার বাড়িতে ল্যান্ডফোন আছে এবং কেয়ারটেকার নিরাপদের কাছে মোবাইল ফোন আছে। রাশাদ রাহা নিরাপদের কাছে ফোন দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল, দাদু বাড়িতেই বহাল তবিয়তে আছে। আশি-উর্ধ্ব মানুষটা এখন ওল্ড এজ ডিজিজে ভুগছে। যে কারণে প্রায়ই তাকে হাসপাতালে যেতে হয়, মাঝে মধ্যে অ্যাডমিটও থাকতে হয়।

রাশাদ রাহা জুন মাসের বৃষ্টিভেজা সকালে মোটরবাইক টেনে দাদুর লন ঘেরা বাড়িতে চলে এল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কারণে দাদু লনে বসে না থাকাটাই স্বাভাবিক। দাদুকে লাইব্রেরি ঘরেই পাওয়া গেল। হুইল চেয়ারে বসে বসেই একবারে নিচের তাকের কিছু বই ঘাঁটছেন। রাশাদের দিকে না ফিরেই বললেন, 'তুই এসে ভালোই হলো। বেশ লম্বা আছিস। উপরের তাকের একটা বই পেড়ে দে তো। নিরাপদ মইটই লাগিয়ে পাড়ে। কিন্তু এত ভুলভাল পাড়ে যে এই বয়সে আর মেজাজ কন্ট্রোলে রাখা যায় না।'

রাশাদ রাহা উপরের তাকের দিকে এগিয়ে গেল। 'আমি যে এসেছি আপনি বুঝলেন কী করে?'

জ্যোতির্ময় দাদু হাসলেন। সরল হাসি। 'না রে, গোয়েন্দাগিরি করে বুঝিনি, ফোনে নিরাপদের কথা কানে এল। তাছাড়া লাইব্রেরির গ্লাসে তোর ছায়া পড়েছে যে!'

রাশাদ রাহা দাদুর কথামতো 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' নামক বইটা উপরের তাক থেকে বের করে নিয়ে দাদুর হাতে দিতে দিতে বলল, 'বুদ্ধিজীবীর

নোটবইয়ে তোমার কী কাজ? বুদ্ধিজীবী হয়ে গেলে কবে থেকে?'

'দুর, বুদ্ধিজীবী হব কেন? বুদ্ধিজীবীরা নোটবইয়ে কী লেখে জানতে হবে না? হয়তো দেখা যাবে এই নোটবইয়েও তোর রহস্যের কোনো সমাধান থাকতে পারে! হা হা হা!'

দাদুর হা হা হাসি শুনে নিরাপদ উঁকি দিল। নিরাপদকে হাত ইশারায় চলে যেতে বলে দাদু বললেন, 'বল, ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে এই সাতসকালে কি রহস্যভেদ করতে চলে এলি?'

'হত্যারহস্য। আপাতদৃষ্টিতে এবং ডাক্তারি ভাষ্যমতে, হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হলেও ওর মধ্যে রহস্য আছে এবং মনে হচ্ছে সেটা হত্যাকাণ্ডই।'

'প্রখ্যাত শিল্পপতি জামসেদ চৌধুরী মারা যান তার বাড়ির টেনিস লনে একটা পার্টি চলাকালীন। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে পার্টির নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য অতিথিদের সামনেই তার মৃত্যু হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে একজন ডাক্তার এবং পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও ছিলেন। আরো...'

জোতির্ময় দাদু হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন, 'জামসেদ সাহেবের হার্টের প্রবলেম ছিল?'

'হ্যাঁ ছিল। হার্ট বরাবরই দুর্বল। গত বছরই হার্টের একটা বাইপাস সার্জারি হয়। তারপর থেকে উনি খুব সাবধানে নিয়ম মেনে চলতেন।'

'তাহলে হার্ট অ্যাটাকের জায়গায় পরিকল্পিত হত্যা বলে মনে হচ্ছে কেন? পার্টিতে উপস্থিত ডাক্তারের ভাষ্য কী?'

'উনি তৎক্ষণাৎ হার্ট অ্যাটাকেই মৃত্যু ঘোষণা করেন। এমনকি পুলিশ কর্মকর্তাও ব্যাপারটা তাই ভেবে আর বাড়াবাড়ি করেননি। তারপরেও রুটিন মাফিক জামসেদ সাহেবের হাতে থাকা পানীয়র গ্লাসটা পরীক্ষা করে দেখেন, তাতে নির্ভেজাল জুস ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'লাশের পোস্টমর্টেম হয়েছিল?'

'না, দাদু। উপস্থিত ডাক্তার শফি আহমেদ ওনার ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিল। তাছাড়া পুলিশ কর্মকর্তাও ব্যাপারটার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব না দেখায় লাশের উপস্থিত আত্মীয়স্বজন আর কাটাছেঁড়ার ঝামেলায় যেতে চায়নি। স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক গোরস্থানে লাশ দাফন করা হয়।'

'তাহলে এখানে হত্যা রহস্যের কথা আসছে কীভাবে? কে সন্দেহ করেছে?'

'উইল। মানে, জামসেদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা উইল খুঁজতে গিয়ে তার মধ্যে অদ্ভুত একটা চিঠি পায়। উইলের সঙ্গেই লেখা। সেখানে যেকোনো সময় কেউ তাকে হত্যা করতে পারে, এই সন্দেহ প্রকাশ পায়।'

'তুমি পার্টি চলাকালীন কোনো ইনভেস্টিগেশন করেছ? কোনো অস্বাভাবিকত্ব পেয়েছ?

'জি দাদু। তাতে একটা ব্যাপারই আমার অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। পার্টি

দিল অ্যালার্ট থাকার জন্য। 'শরীফ সাহেবের টাকাভর্তি ব্রিফকেসের কথা আপনারা ঠিকই জানতেন। জানতেন বলেই চাচার হার্ট অ্যাটাকের সুযোগ নিয়ে আপনারা ব্রিফকেসটা গায়েব করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা হায়দার আলী দেখে ফেলে। আজীবন আপনার চাচার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কারণে তিনি আপনাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন। আর সেটাই তার কাল হয়। আপনারা ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে হায়দার আলীকে হত্যা করেন। তারপর ব্রিফকেস থেকে টাকা সরিয়ে ব্রিফকেসটা গায়েব করতে পারলেও জলজ্যান্ত একটা মৃতদেহকে গায়েব করতে আপনাদের বেগ পেতে হয়। তাই আপনারা তার অন্তর্ধানের কথা রটিয়ে দেন। কিন্তু কথায় বলে না, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আপনাদের সামান্য একটা ভুলের কারণে আপনারা ধরা পড়ে গেছেন। একটা মৃতদেহকে গায়েব করে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। সার্চ ওয়ারেন্ট দিয়ে সার্চ করলেই মৃতদেহ বেরিয়ে আসবে এবং আমি জানি সেটা কোথায় আছে।'

পাঠক বলুন তো, হায়দার আলীর মৃতদেহ কোথায় আছে? নাভিদ কীভাবে তা বুঝতে পারল?

চলাকালীন দু দুবার টেনিস কোর্টের বৈদ্যুতিক বাতিগুলো নিভে যায়, অথচ তখন ভেতরবাড়ির বাতিগুলো জ্বলছিল। সার্কিট ব্রেকার পড়ে গেছে মনে করে বাড়ির কেয়ারটেকার হামিদ আলী গিয়ে সার্কিট ব্রেকারটা তুলে দেয়। পার্টি একটু সময় গড়াতেই আবার টেনিস কোর্ট অন্ধকার হয়ে যায়। আবারও সার্কিট ব্রেকার তুলে দিতে হয়। কিন্তু তারপর থেকে আর একবারও সার্কিট ব্রেকার পড়েনি। সার্কিটে গোলমাল থাকলে আবারও তো পড়ে যাওয়ার কথা।'

'হুঁ। মনে হচ্ছে, আততায়ীর তার আর দরকার হয়নি!'

'তার মানে আপনিও হত্যা সন্দেহ করছেন?'

'দু দুবার সার্কিট ব্রেকার পড়ে যাওয়া সেরকমই ইঙ্গিত দিচ্ছে। তারপরের ঘটনা বল।'

'আরেকটা অস্বাভাবিকত্বের কথা সবাই যেটা বলছিল, জামসেদ সাহেব হাতের অরেঞ্জ জুস সিপ করে তেতো লাগার কথা বলেছিলেন। কিন্তু ওখানে উপস্থিত সবাই স্বীকার করেছে অরেঞ্জ জুসে কোনো রকম তেতো স্বাদ তারা পায়নি।

'জুসটা তো পরীক্ষা করা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, তাতে কিছু মেশানো পাওয়া যায়নি।

'পাওয়া যাওয়ার কথাও নয়। আমার ধারণা, জুসে যদি কিছু মিশিয়েও থাকে, তাহলে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বদলে ফেলে সাধারণ জুসের গেলাস ধরিয়ে দেয়া হয়। এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড । এখন একটু বল তো, পার্টিতে কে কে ছিল। তাদের কার সঙ্গে জামসেদ সাহেবের কী সম্পর্ক?'

'দাদু, টেনিস কোর্টের পার্টি, বুঝতেই পারছ বেশ বড় পার্টি। পঞ্চাশ-ষাটজনের মতো অতিথি ছিল। তাদের সবার সঙ্গে জামসেদ সাহেবের কী সম্পর্ক তা ডিটেইলস বলতে পারব না। তবে তোমার সুবিধার জন্য কিছু ফটোগ্রাফ দেখাতে পারি, যাতে ওই সময়ে জামসেদ সাহেবের আশপাশে কারা ছিলেন তা বলা যায়।'

ফটোগ্রাফ বললেও রাশাদ তার মোবাইল স্ক্রিনেই ছবিগুলো এনে দাদুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জানাল, স্ক্রল করে গেলে একের পর এক ছবিগুলো চলে আসবে। দাদু একটু মুচকি হাসলেন। তারপর মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। টেনিস কোর্টের ভেতরে টেবিল-চেয়ারগুলো পাতা। টেবিলে সাদা রঙের চাদর। টেবিলের ঠিক মাঝখানে ফুলদানিতে হরেক রকম প্লাস্টিকের ফুল। কয়েকটা ছবি সরিয়ে দাদু কাঙ্ক্ষিত টেবিলের ছবিটা পেয়ে গেলেন। বেশ বড় একটা গোল টেবিল। তার চারদিকে গোটা দশেক চেয়ার সাজানো। জামসেদ সাহেবের ডান

পাশে তার ওয়াইফ মিসেস চৌধুরী, বাম পাশের চেয়ার খালি। তার পাশে জামসেদের বন্ধু শিল্পপতি আকরাম খান, তার পাশের চেয়ারে ডাক্তার আহমেদ, তার পাশে পুলিশের কর্মকর্তা নুরুল আবছার, দুটো ফাঁকা চেয়ারের পরে জামসেদের শ্যালক আজহারুল ইসলাম। টেবিলের মাঝখানের ফুলদানির চারপাশে অতিথিদের জন্য পানীয় ভর্তি গেলাস সাজানো। এখান থেকে যে কেউ যেকোনো গ্লাস তুলে নিতে পারে, আবার ইচ্ছে করলেই একটু অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বদলেও দিতে পারে!

দাদু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখলেন। জামসেদ চৌধুরীর টেবিলের অতিথিদের সম্বন্ধে জেনে নিলেন। একটা ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ থমকে গেলেন। টেনিস কোর্টের চারপাশের টবে বিচিত্র রঙের ফুলের টব। তার মধ্যের একটা টবের কিছু ফুলের পাঁপড়ি সাদা আর কিছু ফুলের পাপড়ি অরেঞ্জ কালারের। দাদু ছবিটা রাশাদ রাহাকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে বললেন।

'একই টবের একই গাছে দুই রঙের ফুল ফুটতে দেখেছিস?'

রাশাদ রাহা দুদিকে মাথা নাড়ল। 'এখানে সেটাই হয়েছে এবং এর মধ্যের একটা রঙ কৃত্রিম। কীভাবে হলো তুই মাথা খাটিয়ে বের কর।'

রাশাদ রাহা বুঝতে পারল। সেও দাদুর পাশে বসে ফটোগ্রাফগুলো দেখতে লাগল। আরেকটা ফটোতে অসঙ্গতি লাগল তার। জামসেদ চৌধুরীর একই টেবিলের ছবি। শুধু এই ছবিতে দুজন মানুষের চেয়ারের অবস্থানের বদল ঘটেছে। জামসেদ চৌধুরীর ডান পাশের চেয়ার খালি। বাম পাশের চেয়ারে মিসেস চৌধুরী বসে আছেন। তার পাশে ডাক্তার আহমেদ এবং তার পাশে বন্ধু শিল্পপতি আকরাম খান, তার পাশের চেয়ারে পুলিশ কর্মকর্তা নুরুল আবছার এবং তার পাশের চেয়ারে শ্যালক আজহারুল ইসলাম, তার পাশে দুটো চেয়ার ফাঁকা।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে রাশাদের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। দাদু রাশাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। 'তুই যে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিস দেখে খুব ভালো লাগল। শুধু গাছের ফুলের পাঁপড়িরই রঙ বদল হয়নি, আরো অনেক কিছুর বদল হয়েছে। আর এই বদলাবদলির খেলায় খুনি কে বা কারা তা ধরা পড়ে গেছে। এটা হার্ট অ্যাটাক নয়, স্রেফ পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।'

পাঠক বলুন তো, জামসেদ চৌধুরী কে খুন করেছে? কীভাবে? জ্যোতির্ময় দাদু তা কীভাবে বুঝতে পারলেন?

গোয়েন্দা যখন হেকিম মুনশি

শীতের সন্ধ্যা। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। হাতে অফুরন্ত সময়। এই সময়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা খড়কুটো জোগাড় করে তার চারিদিকে গোল হয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে গল্প করে। মায়েরা বাইরের উঠোনের চুলোয় গরম গরম ভাপা পিঠা বানিয়ে ছেলেমেয়েদের হাতে ধরিয়ে দেয়।

কিন্তু রাউতাড়া গ্রামের চিত্র ভিন্ন। শুধু রাতে নয় দিনের বেলাতেও মূর্তিমান আতঙ্ক স্কন্ধকাটা ডাকাতের আবির্ভাবে গ্রামের ছেলেমেয়েরা নয়, বুড়োরাও সূর্য পাটে বসার আগেই ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে বসে থাকে। স্কন্ধকাটা ডাকাত নাকি নিজের কাটা মাথা নিজেই হাতে করে যে বাড়িতে বা দোকানে ডাকাতি করবে সেখানে সংকেত দিয়ে আসে। তারপর রাতে দলবল নিয়ে হামলে পড়ে।

ঘরে বসে শীত শীত করছিল হেকিম মুনশির। তিনি উঠোনে বেরিয়ে এলেন। অবস্থাসম্পন্ন চেয়ারম্যান বাড়ি হওয়ায় চারিদিকে পাঁচিল তোলা রয়েছে। মাঝখানের উঠোন সুরক্ষিতই বলা যায়। তিনি উঠোনে এসে হাঁক পারলেন, ‘ফজু, জলু, মাকু, ডিটু, কোথায় রে সব! মাথাকাটা ডাকাতের ভয়ে সব ঘরে দরজা দিয়ে বসে আছিস! উঠোনে বেরিয়ে আয়। আগুন জ্বালিয়ে ওম করি। আর তোর মায়েদের বল ভাপা পিঠা করতে।’

কেউ কোনো সাড়াশব্দ করল না। কোনো ঘরের দরজা খোলার আওয়াজও পাওয়া গেল না।

শেষমেশ হেকিম মুনশি মোক্ষম দাওয়াই ছাড়লেন, ‘ওরে সবাই শোন, ওই মাথাকাটা ডাকাতের ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলেছি। ওতে ভয়ের কিছু নেই। আছে কারসাজি। সবাই মিলে ব্যাটাদের পাকড়াও করে ফেলতে হবে।’

এই কথাতেই কাজ হলো। একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডিটু, ফজু, জলু, মাকু। এমনকি ওদের মায়েরাও বেরিয়ে উঠোনের চুলো, ফুঁ দিতে শুরু

করল। উঠোনজুড়েই কেমন যেন একটা উৎসব উৎসব ভাব।

খড়কুটোর আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে হাত সেঁকতে সেঁকতে ডিটু জিজ্ঞেস করল, 'দাদু, তুমি মাথা কাটা ডাকাতের ব্যাপারটা ধরে ফেলেছ বলছিলে। বলো না সেটা কী? ওরকম কাটা মাথা হাতে নিয়ে লোকটা ঘুরে বেড়ায় কীভাবে? মাথা কেটে ফেললে বেঁচে থাকার কথা না। ওটা তো ভৌতিক ব্যাপার!'

মুনশি দাদু হাসলেন। 'সেই ভৌতিক ব্যাপারের লৌকিক ব্যাখ্যা আমি গোয়েন্দাগিরি করে বের করে ফেলেছি।'

ফজু ফোড়ন কাটল, 'তুমি গোয়েন্দাগিরিও জানো নাকি দাদু? তা তো জানতাম না।'

'গোয়েন্দাগিরি বলতে গোয়েন্দাগিরি! একসময় গোয়েন্দাগিরি করে বহু মূল্যবান হীরের নেকলেস উদ্ধার করে দিয়েছিলাম, তা যে সে লোকদের কাছ থেকে নয়, হোমরাচোমরাদের কাছ থেকে...'

মুনশি দাদুর কথা শেষ করতে না দিয়ে মাকু বলল, 'ওই গোয়েন্দাগিরির গল্প পরে শুনব তার আগে মাথাকাটা ডাকাতের ব্যাপারটা বলো। ওটা না জানলে আবার ঘরে গিয়ে দরজা দেব কিন্তু।'

দাদু হেসে বলল, 'খুবই সিম্পল। মেকআপ!'

'মানে?'

'মানে মেকআপ করে স্কন্ধ কাটা হয়েছে। ওর নিজের মাথা ওর কাপড়ের ভেতরেই আছে।'

'তোমার কথা বুঝলাম না দাদু।'

'একটু মাথা খাটিয়ে গোয়েন্দাগিরি করলেই বুঝতে পারতিস। লোকটা মাথা কাটার পরেও ওর উচ্চতা কমেনি। তার মানে কী? মানে নিজের মাথা ওর কালো কাপড়ের মধ্যেই আছে। মাথাটা হেঁট করে রেখে ঘাড়ের কাছ থেকে কেটে ফেলার মতো মেকআপ করে লাল রক্তের মতো রঙ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তাহলে হাতের ওই মাথাটা? ওটা কি ওর নিজের নয়?'

'অবশ্যই না। পুজোর কারিগরদের দিয়ে দেবদেবীর মতো করে নিজের কাটা মাথা বানিয়ে নিয়েছে। ওরও কাটা অংশে রক্ত লাগিয়ে রেখেছে। না হলে একটা লোক তিনদিন ধরে কাটা মাথা নিয়ে ঘুরছে, প্রতিদিনই রক্ত পড়ছে। আসল মাথা হলে এতদিনে রক্ত শুকিয়ে যেতন?'

দাদুর কথা শেষ হতেই ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ততক্ষণে উনুনের চুলা থেকে ভাপা পিঠের মৌ মৌ গন্ধ ছড়িয়েছে। দাদু বললেন, 'দেখে আয় তো আমাদের কজনের মতো কয়েকটা পিঠা হয়েছে কিনা। শীতের মধ্যে ভাপা পিঠা গরম গরম না খেলে কোনো মজা নেই।'

জলু উঠতে উঠতে বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু তার আগে তোমার নিজের ওই গোয়েন্দাগিরির গল্প কিন্তু বলতে হবে। ওই যে হীরে না মোতি চুরির গল্প।'
'আচ্ছা বলব যা। আগে পিঠে নিয়ে আয়।'
দাদু আসর জমিয়ে বসলেন। পিঠে চলে এলো। মুনশি দাদু পিঠা খেতে খেতে বলতে শুরু করলেন, 'তখন জমিদারি প্রথার খুব চল ছিল। তো আমি চাকরির প্রয়োজনে এক জমিদারের গোমস্তা হিসেবে কাজ করছি। জমিদার রাজনারায়ণ আবার খুব সৌখিন মানুষ ছিলেন। বন্ধুবান্ধব লোকজন নিয়ে হৈহল্লা করতে খুব পছন্দ করতেন। প্রায় জমিদার বাড়িতে নানা পালা-পার্বণ অন্নপ্রাসন পুজো-অর্চনা লেগে থাকত। সব বেশ জাঁকজমক করে লোকলস্কর নিয়ে করলেও দিওয়ালির সময়টা একটু অন্যরকম হতো। বাইরে হয়তো প্রজারা মিলে বারোয়ারিভাবে পালন করলেও দিওয়ালিটা জমিদার একটু ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব নিয়ে পালন করতেন। আর এই সময়েই জমিদার চমক দেখাতে পছন্দ করতেন।
দিওয়ালিতে ভোজ দেয়া হতো। তাতে দাওয়াত করা হতো পারিবারিক বন্ধুবান্ধবসহ অনেককেই। আর রাতের ভোজ শেষে থাকত নানারকম মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এই সময়ে কয়েক রকম খেলাধুলা করতে পছন্দ করতেন জমিদার বাবু। সেবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। রাতের ভোজ শেষে জমিদার বাবুর বৈঠকখানায় মজার খেলায় মেতে উঠলেন ঘনিষ্ঠ কয়েকজন। এদের একজন হলেন পাশের এস্টেটের জমিদার লক্ষ্মীকান্ত বাবু, হীরে জহরত মণি মুক্তো জমানোর শখ এর বহুদিনের।
আরেকজন হলেন জমিদারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রকৃতি প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল, জঙ্গলে জঙ্গলে গাছপালা আর বার্ড ওয়াচিং করেই এর সময় কাটে।
সৌখিন শিকারি ও জমিদারের বিপত্নীক বন্ধু কাম জমিদারের ব্যবসা দেখাশোনা করেন হরনাথ চক্রবর্তী, শিকারি হলেও শহরে তার নিজের একটা জুয়েলারির দোকান আছে।
আর আছেন জমিদারের নায়েব রমাকান্ত কামার, লোকটা নায়েব হলেও জমিদার এর ওপরে খুবই ভরসা করেন। সেই সঙ্গে গোমস্তা হিসেবে আমি তো ছিলামই।
দিওয়ালির কারণে বৈঠকখানার চারিদিকে ছোট ছোট মাটির পাত্রে রেডির তেল, সরিষার তেল, ঘি, আর মোম রেখে সলতে দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে বসেই আমরা জমিদারের শখ মেটাতে নানারকম খেলা খেলছিলাম।
প্রথমেই তাস-পাশা খেলা চলছিল। হঠাৎই খেলার মাঝখানে জমিদার বাবু বলে উঠলেন, 'তোমাদের তো আসল জিনিসটাই দেখানো হয়নি। এবারে

আমার কালেকশন কি, সেটাই তো দেখলে না।'

সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠল। জমিদার বাবু আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন। আমাকে কাছে ডেকে বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে। আমি জমিদার বাবুর সঙ্গে গেলাম। উনি চাবি দিয়ে ওনার আয়রনসেফ খুলে বেশ বড়সড় সাইজের একটা পল কাটা হীরে বের করলেন। ওটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে চলো। দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।'

আমি জমিদারের কথামতো হীরে নিয়ে ড্রয়িংরুমে এলাম। সত্যি বলতে কি এত বড় সাইজের প্রায় সুপারির মতো বড় হীরে আমি আর কখনও দেখিনি। হীরে দেখে ওদের সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এক হাত ঘুরে আরেক হাতে হাতে চলতে লাগল। তাস-পাশা খেলা মাথায় উঠল। জমিদার বাবু তাড়িয়ে তাড়িয়ে বন্ধুদের বিস্ময় উপভোগ করছিলেন। ওরা জিজ্ঞেস করতে লাগল কোহিনুরের সাইজের এই হীরেটা জমিদার বাবু কোথায় পেলেন?'

জমিদার বাবু উত্তর না দিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'বলব, বলব। আগে পার্টি শেষ হোক। এই হীরেটাতে একটা রহস্য জড়িয়ে আছে। সেই রহস্যটার সমাধান হলেই বলব। তার আগে নয়। তোমরা হীরে দেখতে চেয়েছিলে, মন ভরে দেখে নাও।'

ওরা হীরে দেখা শেষ করলে আমি জমিদার বাবুকে বললাম, 'বাবু, হীরেটা জায়গামতো আয়রনসেফে রেখে আসুন।'

জমিদার বাবু উদাত্ত হেসে বললেন, 'থাক না ওখানে টেবিলের উপরে। আমাদের বৈঠকখানা শোভা করে মধ্যমণি হয়ে।' তারপর যেন একটু জোরে জোরেই ওদের সবাইকে শুনিয়ে বললেন, 'এখানে যারা এসেছে ওরা সবাই আমার বন্ধু মানুষ, ভদ্রলোক। চুরিচামারির ধান্ধায় কেউ যাবে না। আর এত বড় হীরে চুরি করে কেউ এখান থেকে বেরিয়ে যেতেও পারবে না।'

জমিদার বাবুর কথায় সবার মুখ যেন চুন হয়ে গেল। কেউ খেলায় মনোযোগ বসাতে পারল না।

এবার জমিদার বাবু বললেন, 'এখন একটা মজার খেলা খেলা যাক। সবাই শোন, আমি এখন এক এক করে ফুঁ দিয়ে এই ঘরের সব দিওয়ালির বাতি নিভিয়ে দেব। সবার কাছে দিয়াশলাই দেয়া হবে। যত দ্রুত এবং সবচেয়ে বেশি যে দিওয়ালির বাতি জ্বালাতে পারবে সে-ই এই খেলার প্রথম এবং আজকের পুরস্কারটা তার কপালেই জুটবে। সবাই দিয়াশলাই নিয়ে প্রস্তুত। আমি আর মুনশি মিলে ফুঁ দিয়ে বাতিগুলো নিভিয়ে দিচ্ছি। আমরা দুজনই শুধু এই খেলায় অংশ নেব না। আমরা দর্শক এবং বিচারকের ভূমিকা পালন করব। ঠিক আছে?'

আমরা দুজনে সব বাতি নিভিয়ে দিলাম। গোটা বৈঠকখানা গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। জমিদার বাবু হুইসেল বাজাতেই একে একে বাতি জ্বলে উঠতে লাগল। আমরা দুজন শুধু নজর রাখতে লাগলাম কে কোন দিককার বাতিগুলো জ্বালছে।
একসময় সময় শেষ হলো। ঘরের প্রায় সব বাতি জ্বলে উঠেছে। শুধু একটা রেড়ির তেলের বাতি, একটা ঘিয়ের বাতি আর একটা মোমবাতির বাতি জ্বলেনি।
কিন্তু বাতির উজ্জ্বল আলোয় সবাই একটা জিনিস দেখে বিস্মিত হলো।
হীরে নেই! অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কেউ একজন হীরে চুরি করেছে। সবাই হীরের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বৈঠকখানার দরজা লাগানো। কেউ ঘর থেকে বের হয়নি। হীরে থাকলে ঘরের মধ্যেই আছে অথবা কারোর কাছেই...
আমি কথাটা বলতেই জমিদার বাবু জোরে জোরেই বললেন, 'না না, তা কী করে হয়, ওরা আমার বন্ধু মানুষ, ভদ্রলোক। ওদের শরীর সার্চ করাটা শোভনীয় দেখাবে না। তবে দেখ তুমি যদি ওদের অনুমতি নিয়ে করতে পারো, তাহলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু দেখো, আমার বন্ধুদের কারো যেন অসম্মান না হয়।
জমিদার বাবু বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, তল্লাশিতে কেউই আপত্তি করছে না, বরং খুশিমনেই রাজি হয়ে গেছে।
তল্লাশিতে তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। বার্ড ওয়াচার দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে পকেটে লেন্স, আর গাছের পাতা পাওয়া গেল। আর হাতে রেড়ির তেল লেগে আছে। বোঝাই যাচ্ছে রেড়ির তেলের বাতি জ্বেলেছেন উনি। নায়েব রমাকান্ত কামারের কাছে কয়েকটা হিসাব লেখা কাগজপত্র, চশমার খালি খাপ পাওয়া গেল। নায়েবের হাত ঘিয়ে জবজব করছে।
জমিদারের বন্ধু জমিদার লক্ষ্মীকান্ত বাবুর কাছে বলতে গেলে কিছুই পাওয়া গেল না। পকেটে আধা পাইন্ট ঠান্ডা মদের বোতল পাওয়া গেল। তার কিছুটা ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই ফাঁকে কখন মদ খেলেন তা কারোর নজরে পড়েনি। ওনার হাতে মোম লেগে রয়েছে। বোঝাই যায়, মোমের বাতিগুলোই জ্বালিয়েছেন উনি।
এরপরে আসে সৌখিন শিকারি হরনাথ, লোকটার পকেটে কয়েকটা বন্দুকের গুলি পাওয়া গেল। আর একটা লগবুক। হাতে লেগে আছে সরিষার তেল।
আর তখনই আমি বুঝে ফেললাম কে হীরে চুরি করেছে এবং চুরি করে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।

এখন, তোমরা বলো তো কে হীরে চুরি করেছে এবং চুরি করে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে? আমি কীভাবে তা বুঝতে পারলাম? বলেই মুনশি দাদু ভাপা পিঠায় মনোযোগী হলেন।

অপহরণ রহস্য

দুই দুইটা ঘরোয়া কেসে তমাপ্পির সাফল্য এল। এরপরে কীভাবে কীভাবে জানি মহিলা মহলে তমাপ্পির শখের গোয়েন্দাগিরির খবর ছড়িয়ে পড়ল। তার সঙ্গে পূর্ণতাকেও সহকারী হিসেবে মহিলারা জেনে গেল। বিশেষত পূর্ণতার স্কুলে খাতির বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে। ক্লাসের মিসেরা মাঝে মধ্যেই তাকে 'মিস সত্যান্বেষী' বলে ডাকে। আর বান্ধবীরা ডাকে 'টিকটিকির লেজ' মানে তমাপ্পি টিকটিকি, পূর্ণতা টিকটিকির লেজ।

এই প্রথম বাইরের কোনো কেস তমাপ্পির কাছে আসায় নিজেকে গোয়েন্দা হিসেবে বেশ একটা অনুভব হয় তার। সহকারী হিসেবে পূর্ণতা মাঝেমধ্যেই স্কুল ছুটির পরে বা অবসরে তমাপ্পির কাছে ঢু দিয়ে যায়। মেয়ে অসৎ সঙ্গে পড়ে বখে যাচ্ছে না বা পড়াশোনার তেমন ক্ষতি হচ্ছে না, তা দেখে পূর্ণতার বাবা-মাও ওকে তমাপ্পির সঙ্গে গোয়েন্দাগিরি করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

পূর্ণতাকে দিয়ে ভদ্রমহিলাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে তমাপ্পি একটু সময় নিয়েই ড্রয়িংরুমে এল। গোয়েন্দার বেশভূষাস্বরূপ ফটোসাংবাদিকদের মতো অনেক পকেটওয়ালা একটা কটি ও কামিজের উপর চড়িয়ে এসেছে। বেশ অভিজাত বেশভূষার পাংশুটে ফ্যাকাসে মুখের ভদ্রমহিলা তমাপ্পিকে নিজের পরিচয় মিস শায়লা জানিয়ে বললেন, 'আমার ভাগ্নে রীমাকে অপহরণকারীরা তুলে নিয়ে গেছে। বোনের মৃত্যুর পর সে আমার কাছেই মানুষ হয়েছে। আমিও ওর একমাত্র বৈধ অভিভাবক।'

'অপহরণ হয়েছে কখন জানলেন?'

'আজ দুপুরেই। ও সকালে ক্লাসে গিয়েছিল। সাধারণত দুপুরের দিকে ফেরে। ক্লাসে যাওয়ার পর থেকে ওর ফোন বন্ধ পাচ্ছিলাম। ভাবলাম ক্লাসে আছে বলেই। ঠিক সেই সময়েই একটা অপরিচিত নম্বর থেকে আমার মোবাইলে কল আসে। জানায়, রীমাকে অপহরণ করা হয়েছে। দশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ওকে উদ্ধার করতে হবে। যথাসময়ে যথাস্থানে টাকা

না দিলে বা পুলিশকে জানালে রীমাকে চিরদিনের মতো হারাতে হবে।'
'ফোন পাওয়ার পরে আপনি সরাসরি আমার কাছে এসেছেন?'
'হ্যাঁ। আপনার মুন্নি খালা আমার পরিচিত। তিনিই আপনার কথা জানিয়ে ঠিকানা দিয়ে দিলেন। আপনি যদি দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন, তাহলে পুলিশি ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'
'দ্রুত ব্যবস্থা বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'
'শুনুন, আমি রীমার অভিভাবক। ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই পরিমাণ টাকা তুলে আমি আপনার হাতে দিতে চাই। আপনি টাকাটা যথাস্থানে অপহরণকারীদের দিয়ে ওকে মুক্ত করে নিয়ে আসবেন। আপনার পারিশ্রমিক আমি দেব।'
'যে ফোন নম্বর থেকে কল এসেছিল সেটা কি দেখতে পারি?'
'ওটা দেখা যাচ্ছে না। প্রাইভেট নম্বর হিসেবেই কল এসেছে।'
'তাহলে গোয়েন্দা হিসেবে আমি কিছু করতে পারব না!'
'তা করতে গেলে হয়তো হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। ওরা যা বলছে, তা-ই আমাদের করা দরকার।'
ভদ্রমহিলা আরো কিছু ডিটেইলস জানালেন। জানালেন রীমার বয়স এখন সতেরো বছর নয় মাস। আর তিন মাস পরে রীমা আঠারোয় পড়বে। তখন আইনমতে, তার সম্পত্তির মালিক সেই হবে। তিনি ভারমুক্ত হবেন জানিয়ে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে গেলেন।
পূর্ণতা বিরক্ত গলায় বলল, 'ফালতু কেস। মুক্তিপণের টাকা দেয়ার জন্য গোয়েন্দার কী দরকার সেটাই তো বুঝলাম না। বাসার ড্রাইভারও তো ও কাজ করতে পারে!'
'হু। তাই তো ভাবছি। ভদ্রমহিলা কি কোনো চাল চাললেন...' তমাপ্পির কথা শেষ হওয়ার আগেই কলিংবেল বেজে উঠল। তমাপ্পি দরজা খুলে দিলেন। পঞ্চাশোর্ধ মুখে বলি রেখা, মাথায় হিজাব পরা একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা বেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কি গোয়েন্দা তমা খন্দকারের...'
তমাপ্পি ভদ্রমহিলাকে থামিয়ে বলল, 'আমিই তমা। আসুন, ভেতরে আসুন।'
ভদ্রমহিলা সোফায় বসে একটু ধাতস্ত হয়ে বললেন, 'আমাকে একটু পানি খাওয়ান।'
তমাপ্পি বলার আগেই পূর্ণতা ভেতরের ঘর থেকে পানির গ্লাস ও ওয়াটার বোতল নিয়ে এল। ভদ্রমহিলা ভদ্রতার ধার না ধরে পুরুষালি ভঙ্গিতে সরাসরি বোতল থেকে পানি গলাধঃকরণ করে বললেন, 'কেউ আমার পিছু নিয়েছিল। আমার সেরকমই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনাদের বাসা থেকে

কি একটু আগে কি শায়লা বেরিয়ে গেল? আমি ঠিকমতো দেখতে পাইনি। কিন্তু আমার কাছে ওরকমই মনে হলো।'
'জি, উনি ওনার নাম শায়লাই জানিয়েছিলেন।' তমাপ্পি এখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।
'বোঝো! ও কী জন্য এসেছিল? রীমার অপহরণের ব্যাপারে?'
'জি। আপনি জানলেন কীভাবে? মানে আপনাদের কানেকশনটা কী?'
'আমিও রীমার ব্যাপারে এসেছি। আমি ওর বড় ফুপু। রীমার বাবা-মা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পরে আমিই ওর অভিভাবক। যদিও রীমা ওর খালা শায়লার কাছে মানুষ হয়েছে। কিন্তু একজনের কাছে মানুষ হলেই বৈধ অভিভাবক হয়ে যায় না! নাকি বলেন!'
তমাপ্পিও পূর্ণতা একে অন্যের দিকে তাকাল। তাদের চোখাচোখিতে বোঝা গেল কেস জটিলতর হতে শুরু করেছে। তমাপ্পি শান্তস্বরে বলল, 'ব্যাপারটি কি একটু খুলে বলেন?'
ভদ্রমহিলার কাছ থেকে জানা গেল, অপহরণের দিনদুপুরেও তার রীমার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। দুপুরের দিকে অপহরণকারীরা প্রাইভেট নম্বর থেকে ফোন দিয়েছিল, তার কাছে পনেরো লক্ষ টাকা দাবি করেছে। স্পটও দিয়েছে, একই জায়গায়। কিন্তু ঘাপলা বেধেছে অন্য জায়গায়, তিনি রীমার অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখেন, সেখানে দশ লক্ষ টাকা কম আছে। তখনই তার মনের মধ্যে খটকা জাগে। সেজন্যই তিনি গোয়েন্দার শরণাপন্ন হয়েছেন। তার এক রিলেটিভ তমাপ্পির কথা জানিয়েছে।
'এখন আমাকে কী করতে বলেন?' তমাপ্পি ধন্ধে পড়ে গেছে।
'আপনি শুধু অপহরণ নয়, ওর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওলটপালটের ব্যাপারেও তদন্ত করুন। তমা নিজে টাকা তুলতে পারে না, অন্য কেউ তুলেছে। এবং আমার ধারণা, টাকা তোলার সঙ্গেই এই অপহরণও জড়িত।'
ভদ্রমহিলাও উপযুক্ত পারিশ্রমিকের কথা বলে চলে গেলেন। তমাপ্পি ভেতরের ঘর থেকে ল্যাপটপ নিয়ে এল। পূর্ণতা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি এখন ল্যাপি নিয়ে বসলে কেন? ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের খোঁজখবর নিতে যাবে না?'
'আগে প্রাথমিক কাজটা ল্যাপটপে সেরে নেই। এখন ফেসবুকেই অনেক গোয়েন্দাগিরি করা যায়। চাকরিদাতারা পর্যন্ত প্রার্থীরা ফেসবুক প্রফাইল চেক করে।'
ফেসবুকে রীমার অ্যাকাউন্ট পেয়ে গেল তমাপ্পি। আর সেখান থেকেই বুঝতে পারল ওই দুই ভদ্রমহিলা সত্যিই একজন খালা, আরেকজন ফুপু এবং রীমা খালার কাছেই মানুষ হয়েছে। তবে কে যে তার বৈধ অভিভাবক, মানে সহায় সম্পত্তির অভিভাবক তা ফেসবুক থেকে বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু

একটা জিনিস পাওয়া গেছে, রীমার একজন প্রেমিক আছে। রাজু আহমেদ। এখনও বেকার। চাকরিপ্রার্থী। তবে ফেসবুক স্ট্যাস্টাস পড়ে মনে হচ্ছে রীমার আঠারো বছরের সাবালিকা হয়ে সম্পত্তির মালিক হয়ে গেলে রাজুর আর চাকরির দরকার পড়বে না। এমনকি হয়তো আঠারো বছর হয়ে গেলেই ওরা বিয়ে বসবে। সেরকমই ইঙ্গিত ফেসবুক স্ট্যাস্টাস দিচ্ছে। সুকান্তর 'আঠারো বছর' কবিতার লাইন দিয়ে তার পরে লিখেছে, 'উই আর ওয়েটিং!'

তমাপ্লি উঠতে উঠতে বলল, 'চল, এবার বেরুনো যাক। প্রথমে প্রেমিকের খোঁজ। তারপর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এবং তারপর আমাদের ক্লায়েন্ট।'

রাজুকে তার মেসেই পাওয়া গেল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, সে রীমার অপহরণের কিছুই জানে না। দুপুরেও তার রীমার সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়েছে। শুধু দুপুরের পর থেকে রীমার মোবাইল বন্ধ পাচ্ছে। এমনকি ফেসবুক বা কোথাও নেই। হুটহাট মোবাইল বন্ধ করে রাখার বদভ্যাস রীমার আছে, কাজেই সে বেশি একটা পাত্তা দেয়নি।

রীমা অপহৃত হয়েছে, গোয়েন্দা খোঁজ করছে শুনে রাজু বেশ হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু রাজুর কাছ থেকেই একটা তথ্য পাওয়া গেল, খালার সঙ্গে রীমার সম্পর্ক ইদানীং ভালো যাচ্ছিল না। আর ব্যাপারটা তার সঙ্গে মেলামেশা নিয়েই। রীমার ব্যাংকের টাকার ব্যাপারেই সে শুনেছিল, লাখ বিশেক টাকা আছে বলেই জানত। আঠারো বছর হয়ে গেলেই তারা বিয়ে করবে এরকমটি জানার পর থেকে খালা অসহযোগিতা করছিল।

ব্যাংকে গিয়েই কেস অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। রীমার অ্যাকাউন্টে মাত্র দশ লক্ষ টাকা আছে। এবং সেই টাকাটা তোলার জন্য রীমার অ্যাকাউন্টের বৈধ অভিভাবক মিস শায়লা চেক জমা দিয়েছেন। ব্যাংকিং আওয়ারেই টাকাটা তোলা হবে। হ্যাঁ, রীমার ফুপু অ্যাকাউন্ট নম্বর নিয়ে কত টাকা আছে জানতে এসেছিল, কিন্তু টাকা তোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, তিনি এই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের অভিভাবক নন। তবে তিনি জানিয়েছিল, রীমার অ্যাকাউন্টে বিশ লক্ষেরও বেশি টাকা থাকার কথা। তার ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি এমনটিই জেনেছিলেন।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে তমাপ্লি পূর্ণতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেস এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, একটু চাপ দিলে রীমা এখন কোথায় আছে তাও জানা যাবে। তবে অপহরণকারীদের একটা ভুলেই কেসটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন চল, আমরা পুলিশ সঙ্গে করেই এগিয়ে যাই।'

এখন পাঠক বলুন তো, কে রীমাকে অপহরণ করেছে? তমাপ্লি কীভাবে তা বুঝতে পারল?

ইশারা

বোবা মানুষের রাগ বেশি। বোবা মানুষ কালা হয়। কানে শুনতে পায় না বলে কথা বলতে পারে না, তাই বোবা।

শোকর বোবা ও কালা দুইই। কিন্তু গ্রামের লোকে তাকে শোকর বোবা না বলে শোকর কালা বলে ডাকে। তাতে শোকরের কোনো আপত্তি নেই। কারণ সে শুনতে পায় না। সে বোঝে ইশারা। কেউ তাকে হাত ইশারা করে ডাকলে শোকর বুঝতে পারে।

কোনো মানুষের একটা বা দুইটা ইন্দ্রিয় অক্ষম হয়ে গেলে অন্য ইন্দ্রিয়গুলো আরো বেশি সজাগ হয়। সে কারণে শোকর অনেক দূরের জিনিসও খুব স্পষ্ট দেখতে পায়। লোকে বলাবলি করে, শোকর নাকি রাতের অন্ধকারে ভূতও দেখতে পায়।

বোবা কালা বলেই বোধহয় শোকর খায় বেশি। এক গামলা পানতা ভাত সে শুধু কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে। তাই তো তার শরীরটা এই তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে বেড়ে উঠেছে পরিপূর্ণ যুবকের মতো। কেউ বলে মোষের গতর। কেউ বলে বাঘের শক্তি। তা ঠিক, শোকরকে বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না সে কিশোর না যুবক।

মোষের মতো শরীরে সে গাধার মতো খাটতে পারে। আর কোনো কাজ একবার দেখিয়ে দিলে খুব তাড়াতাড়িই শিখে নিতে পারে। সেজন্যই শোকরকে মুনিষ রাখার জন্য গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন মানুষের মধ্যে টানাটানি পড়ে যায়। শোকর খায় একটু বেশি, কিন্তু কাজ করে তার চেয়েও বেশি। আর গ্রামের লোকের ঘরে ধান ভরন্ত। খেয়ে কেউ কমাতে পারবে না।

মনু চাষার বাড়িতেই শোকর ক্ষেতের মহিন্দরের কাজ করছিল। ঘোর বর্ষাকাল। এখনই ধানের চাতর ফেলে ধান রোয়ার সময়। অন্য কৃষকের সঙ্গে শোকরও নেমে পড়েছে কাজে। কিন্তু কাজে এখন লোকজন অনেক কম। সবাই কোথায় জানি পালিয়েছে। শোকর একাই কাজে যায়। কেউ

তাকে কিছু বলে না। কিন্তু শোকর বুঝতে পারে, গ্রামে কিছু একটা হয়েছে। গ্রামেই শোকরের বাড়ি। বাবা-মা থাকে। তারাও অতি গরিব। মানুষের বাড়িতে কাজ করে। শোকর বাড়িতে এলে মা প্রথমে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে প্রথমে মুখে বলে, 'তোরে জোয়ান ছাওয়ালের মতো লাগে। মিলিটারিরা তোরে দেখলে গুলি করে মাইরা ফেলাইবো। তুই পলাই যা।' মায়ের কোনো কথা কালা শোকরের কানে ঢোকে না। তবে মায়ের মুখের ধরন দেখেই গুরুতর কিছু বুঝে নেয়। মাও কালা শোকর কিছু বোঝেনি বুঝে ইশারা করে ওকে লুকিয়ে থাকতে বলে।

শোকর গুঙিয়ে ওঠে, 'আ আ উ উ।'

মা বুঝতে পারে ও বোঝাতে চেয়েছে কোথায় পালাবে।

মাও ইশারা করে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যেখানে খুশি জঙ্গলে নদীতে ঝোপঝাড়ে।

বিকেলের আলো মরে যেতেই শোকর মাকে চোখের জলে ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোথাও পালিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে সে? খাবে কি? খিদে পেলে যে সে চোখে অন্ধকার দেখে! আর তাকে পালাতে হবে কেন? বোবা মানুষটা মনের প্রশ্নের কোনো উত্তর পায় না।

সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে আসে। শোকর চলেছে নদীর দিকে। নদীর ঘাটে অনেক বেওয়ারিশ নৌকা বাঁধা থাকে। ওরই একটার মধ্যে সিঁধিয়ে কোনোমতে রাতটুকু পালিয়ে থাকবে। মা টোপলা করে কিছুটা চিড়ে বেঁধে দিয়েছে। তা-ই খাবে।

নির্জন নদীর ঘাটলায় এসে শোকর এদিক-ওদিক চায়। তখনই দেখতে পায় কে যেন ওকে হাত ইশারায় ডাকছে। এগিয়ে যায় শোকর। তাদের গ্রামের মেম্বারের ছেলে বাদল। ও এদিকে কি করছে? কিছুদিন ধরে বাদল ভাইকে দেখেনি শোকর।

বাদল জানে, শোকর কালা। সে কাছে ডেকে শোকরকে ইশারায় জিজ্ঞেস করে, এদিকে একা একা কী করছিস। এদিকটা ভালো না।

শোকর বুঝতে পারে না কেন গ্রামের ক্ষেত ভালো না, ভালো না নদীর ঘাট। সে আ উ কি করে কিছু একটা বোঝাতে চায়। বাদল বোঝে না। তখন শোকরও ইশারা করে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে পড়ার মতো অভিনয় করে দেখায়। হাতে কাপড়ের পুঁটলি আর শোকরের অভিনয় দেখে বাদল বুঝে ফেলে শোকর মিলিটারির ভয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যেতে এসেছে।

বাদল ইশারায় বলে, আমার সঙ্গে যাবি। পালিয়ে থাকতে পারবি। খাওয়া-দাওয়াও পাবি। আমিও তো পালিয়ে আছি।

সূর্যাস্তের রক্তিম আলোয় শোকরের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বাদল ভাইয়ের সঙ্গে নৌকায় চড়ে বসে সে।

বাদলের ক্যাম্পে শোকর অল্পদিনেই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তার প্রধান কারণ শোকরের অক্লান্ত পরিশ্রম। কমান্ডার শোকরকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করে। রাতবিরাতে ভয়ডরহীনভাবে শোকর যেকোনো জিনিস এক জায়গা থেকে অন্ধকারের মধ্যেও অন্য জায়গায় নির্দ্বিধায় নিয়ে যেতে পারে। ক্যাম্পে কয়েক দিন থাকার পরেই কমান্ডার বুঝে যায়, অকুতোভয় এ কিশোরকে দিয়ে শুধুমাত্র ক্যাম্পের চাল-ডালের বস্তা টানিয়ে নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাছাড়া ক্যাম্পের অস্ত্রপাতি খুব অল্প সময়েই শোকর ভালো করে চিনে ফেলেছে। এমনকি দু-একটা চালাতেও জানে। যুদ্ধের সময়ে যখন লোকবলের অভাব তখন ওকে যুদ্ধে নামিয়ে দিলে কেমন হয়!

বাদলের সঙ্গে পরামর্শ করে কমান্ডার শোকরের মতামত জানতে চাইল।

শোকরের হাসি একান ওকান হয়ে গেল। হাতে অদৃশ্য অস্ত্র তুলে ঠাই ঠাই করে গুলি করার ভঙ্গিতে সে বুঝিয়ে দিল, অস্ত্র হাতে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সে মুখিয়ে আছে।

অসীম সাহসী হলেও শোকর কালার একটা সমস্যা আছে। যেটা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে বাদল এবং কমান্ডার দুজনই বুঝতে পেরেছে। শোকর কালা গুলি করতে থাকলে একইভাবে গুলি করতে থাকে। তাকে কোনোভাবেই নিরস্ত্র করা যায় না। আর তা করতে গেলে ইশারা বোঝে এরকম একজন মানুষ তার আশেপাশে থাকা লাগে। কিন্তু তাতে লোকবল কমে যায়। ওদিকে দুর্দান্ত সাহসী শোকর গোলগুলিতে বেশ ওস্তাদ। তার হাতের নিশানা খুব সহজে ফস্কায় না।

শেষমেশ সিদ্ধান্ত হলো ইশারায় পারদর্শী শোকর কালার জন্য সংকেতের ব্যবস্থা করা হবে। ক্যাম্পে বসেই শোকর কালাকে সেই সংকেতগুলো শিখিয়ে দেয়া হলো। যেহেতু কানে শোনে না তাই কমান্ডারের সংকেত ছিল যখন ওর মাথায় চড় দেয়া হবে তখন শোকর গুলি শুরু করবে। পিঠে চড় দিলে পিঠটান। আর পশ্চাৎদেশে চড় দিলে গুলি বন্ধ। অস্ত্রসহ পালাতে হবে।

বাদল শোকর কালাকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে। বাদলের সঙ্গে আরো আছে সবুর মাঝি ও লোকমান শিকদার। এদের মধ্যে সবুর মাঝি একটু গোঁয়ার ধরনের। যুদ্ধের কলাকৌশল তেমন কিছুই জানে না, অস্ত্র চালানোটা কোনোমতে শিখেছে, কিন্তু অসীম সাহসী। এরকম একজন সাহসী লোক পাশে থাকলে অন্যদের সাহসও দশগুণ বেড়ে যায়। লোকমান শিকদার সংকেত আর ইশারার ব্যাপারে পারদর্শী। ইশারা ভাষা তার পুরোপুরি জানা। অন্ধকার না হলে অনেক দূর থেকেই ইশারায় বুঝে ফেলে কে কী বলতে চাইছে।

কমান্ডারের নেতৃত্বে ওরা বেরিয়েছে অপারেশনে। শোকর কালা বাদলের পাশেই আছে। অন্ধকার রাত। গোলাগুলির স্ফুলিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখা

যায় না। মুষলধারে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। বৃষ্টিতে সবাই জমে যাচ্ছে। মিলিটারিরা নিরাপদ ঘাঁটিতে থেকে গুলি করছে। এদিকে বৃষ্টি-কাদায় মুক্তিবাহিনীর গোলাগুলিতে তেমন কাজ হচ্ছে না। মিলিটারিরা একটানা গুলিবর্ষণ করে চলেছে। মুক্তিবাহিনী মাঝে মাঝে পাল্টা জবাবে দু-একটা গুলি করছে। শোকর কালা এলএমজি হাতে চুপচাপ বসে আছে। বাদল ভাই বা কমান্ডার কারোর কাছ থেকে তেমন কোনো সংকেত পায়নি। লোকমান শিকদারও কোনো ইশারা করেনি।

কমান্ডার চুপি চুপি বাদলকে বলল, 'এভাবে কাজ হবে না। শুধু শুধু গোলাবারুদ ভিজিয়ে লাভ নেই।'

'কী করতে চাও?'

'চল পিঠঠান দেই। ওই কালাটাকে ডাক দে। না হলে লোকমানকে বল ইশারা করতে।'

অন্ধকারে শোকরকে ঠিকমতো ঠাহর করা যাচ্ছে না। ও বসে দাঁড়িয়ে না শুয়ে তাও বোঝা যাচ্ছে না। শুধু ঝোপের মতো একটা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে ওপাশে। কিন্তু আর সময় নেই। কমান্ডার পিছু হটার নির্দেশ দিয়েছেন।

বাদল লোকমানকে চুপিসারে ডাক দিল। ফিসফিস করে কিছু একটা বলল। লোকমান অন্ধকারে এগিয়ে গেল শোকর কালা যেদিকে আছে ধারণা করছে সেখানে। শোকর কালাকে পিছু হঠার জন্য বলতে চাইল। কিন্তু অন্ধকারে কোথায় কী করল বুঝতে পারল না। শোকর কালা ক্রলিংয়ের ভঙ্গিতে পজিশন নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছিল। আর যায় কোথায়! শোকর কালা ভাবে, কমান্ডার তাকে গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এলএমজি নিয়ে সে এককভাবে একাধারে অন্ধকারের মধ্যে মিলিটারির আস্তানা লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে।

বাদল ভুলটা বুঝতে পারে। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। ওদিকে মিলিটারিরা এদিকে গোলাগুলি বন্ধ দেখে ভেবেছিল এরা পিছু হটে চলে গেছে। ওরাও একটু আয়েশ করে জিরিয়ে নিচ্ছিল। পজিশনে তেমন কেউ ছিল না। এরকম সময়ে শোকর কালার অব্যর্থ লক্ষ্যে মিলিটারিরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে পজিশন নিতে নিতে শোকর তাদের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে।

বাদল আর কমান্ডার ভুল বুঝতে পারলেও শোকর কালার লড়াইয়ের ধরন এবং আকস্মিক ওদিক থেকে গোলাগুলি বন্ধের আওয়াজে ওরাই লড়াইয়ে ফিরে এলো। একসঙ্গে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র গর্জে উঠল। বৃষ্টিও ধরে এসেছিল একটু। আর সেই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে লাগল শোকর কালার নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী।

ওইদিন মিলিটারি ক্যাম্পের পতন না হলেও শোকর কালার আকস্মিক

গোলাগুলিতে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় ওদের। আর ভুল সংকেতের কারণে সেদিন পিছু হটতে চাওয়া মুক্তিবাহিনী আবার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে মিলিটারিদের চরম ক্ষয়ক্ষতি সাধিত করে।

এখন পাঠক বলুন তো, সেদিন লোকমান শিকদার কী ভুল করেছিল? কোন ভুল সংকেতের কারণে শোকর কালাসহ অন্যরা আবার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল? সংকেতটা কী ছিল?

ঘোড়া ধরা সহজ নয়

গোয়েন্দা নাভিদ মলাট দেয়া বই থেকে মুখ না তুলেই সহকারী জুয়েলকে উদ্দেশ করে বলল, 'ঘোড়াকে মানুষ পোষ না মানালে মানবসভ্যতার এত উন্নতি সাধিত হতো না।'

জুয়েল সকালের নাশতা বানাতে ব্যস্ত। সেও মুখ না তুলেই বলল, 'কেন ভাই, আগে কি ঘোড়া মানুষের পোষ মানত না?'

'প্যালিওলিথিক যুগের আদি মানবের গুহাচিত্রে ঘোড়ার ছবি পাওয়া গেলেও তখনও মানুষ ঘোড়াকে পোষ মানাতে শেখেনি। ইউরেশিয়ার স্তেপ অঞ্চলে মোটামুটি সাড়ে তিন চার হাজার বছর খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানানো হয়। মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠার পর ঘোড়া প্রভাব বিস্তার করল মানুষের জীবনযাত্রায়। যুদ্ধ, যোগাযোগ, ব্যবসা, ক্রীড়াক্ষেত্র, শিকার এসব ক্ষেত্রে ঘোড়ার আগমন বদলে দিল মানুষের জীবনযাত্রা।'

'তুমি সাতসকালে ঘোড়ার পিছনে লাগলে কেন?' জুয়েল ফ্রাইপ্যানে ডিম ভাজতে ভাজতে বলল।

'কারণ আছেরে বৎস! একটা ঘোড়া খুনের তদন্ত হাতে এসেছে।'

'ঘোড়ার খুন মানে? ঘোড়া খুন হয়েছে? তার তদন্ত? ঘোড়ার ডিমের তদন্ত!' জুয়েল বিরক্ত স্বরে বলল।

'নারে বোকা! ঘোড়া খুন নয়! ঘোড়ার লাথিতে খুন!'

'তাহলে আর কি, সেই ঘোড়াটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন। কেস হাতে নেই বলে এসব আলতুফালতু কেস হাতে নিতে হবে!'

'তুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস না। ঘোড়ার লাথিতে কিভাবে একজন মানুষ খুন হয় সেটাই তদন্ত করে দেখতে হবে। আর তদন্তের ব্যাপারটা...'

ওদের কথা শেষ হওয়ার আগেই কলিংবেলের আওয়াজ। নাভিদ বলল, 'যা, দরজা খুলে দে। থানা থেকে অফিসার এসেছে। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। তুইও রেডি হয়ে নে।'

নাভিদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে পুলিশ অফিসার সামিউল বলল, 'আপনি বলেছিলেন শিকারের জায়গাটায় গেলে কিছু ক্লু হয়তো পাওয়া যেত। তো আমরা সে ব্যবস্থা করেছি। এমনকি সেদিন শিকারে যে কজন ছিলেন সন্দেহভাজন সব কজনকেই আমরা বিশেষভাবে ওখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। আর বোঝেনই তো, পুলিশের অনুরোধ মানেই আদেশ।'

নাভিদ হেসে বলল, 'চলুন রওনা দেওয়া যাক। অনেক পথ। যেতে যেতে হয়তো বিকেল হয়ে যাবে।'

পুলিশের গাড়িতেই রওনা দিল ওরা। জায়গাটা শহর থেকে অনেক দূরে। শেখপুরের জঙ্গল। শেখপুরের জঙ্গলের ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছে বাকি অতিথিরা। ঘোড়ার পায়ের আঘাতে নিহত হওয়া লাশটি এখনও ফরেস্ট বাংলোয় পড়ে আছে। পুলিশি কাজ শেষ হলেই ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। মূলত গোয়েন্দা নাভিদের জন্যই দেরিটা করা হচ্ছে।

ওরা যখন ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছাল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। পুলিশ জিপ বাংলোর সামনে থামতেই সবার মধ্যে কেমন যেন একটু সন্তস্ত্র ভাব বোঝা গেল।

নাভিদ প্রথমেই চলে গেল বাংলোর এক ধারে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা লাশের কাছে। কাপড় সরাতেই বছর ত্রিশের এক যুবকের খোলা শরীরের মৃতদেহ দেখা গেল। বুকের ঠিক মাঝখানে উল্টো ইউ-এর মতো আকৃতির জোড়া পায়ের ঘোড়ার নাল লাগানো লোহার খুরের দাগ। ঘোড়ার জোড়া পায়ের পেছন লাথিতেই মারা গেছে লোকটি। একটা পা হৃদপিন্ড বরাবর হওয়ায় প্রচন্ড আঘাতে হৃদপিন্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মারা গেছে ভিকটিম।

জুয়েল হতভম্ব গলায় বলল, 'ঘোড়ার পায়ের এত শক্তি! পেছন লাথিতে মানুষ মেরে ফেলে!'

নাভিদ লাশের বুকটা ভালোভাবে দেখতে দেখতে বলল, 'হুম! তবে একটা খটকা লাগছে।'

'কী খটকা?' জুয়েলও লাশের দিকে তাকিয়ে বলল। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঘোড়ার খুরের দাগ। এক্ষেত্রে খটকাটা আসে কোত্থেকে?

পুলিশ অফিসার সামিউল বলল, 'নাভিদ ভাই, ঘোড়ায় চড়া শিকারিদের সঙ্গে দেখা করে জেরা করি চলুন।'

'জেরা করার আগে পুরো ঘটনাটা ভালোভাবে জেনে নেয়া দরকার। আপনি কি জানেন?'

'আমি যেটুকু জানি বলছি, প্রভাবশালী ঘোড়া ব্যবসায়ী আজমল খাঁ-র ইচ্ছে ছিল জঙ্গলে ঘোড়ায় চড়ে শিকার করার। তো সেই ইচ্ছেতেই তিনি ঘোড়ায় চড়ে শিকারের আয়োজন করলেন। এক্ষেত্রে বড় বড় কয়েকজন ব্যবসায়ীকেও আমন্ত্রণ করলেন, যারা ঘোড়ায় চড়ে শিকারে আগ্রহী। এক

ঢিলে দুই পাখি। ঘোড়ায় চড়ে শিকারও হলো, আবার নিজের ঘোড়ার অ্যাডভার্টাইজমেন্টও হয়ে গেল। হয়তো কয়েকটা ঘোড়া বিক্রিও হয়ে যেতে পারে। আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন ব্যবসায়ীরা। আর আপনি তো জানেনই, ব্যবসায়ীদের মধ্যে রেষারেষি থাকেই।'

'কোন কোন ধরনের ব্যবসায়ী এসেছিলেন সেই আমন্ত্রণে?'

'ভেতরে গেলেই দেখতে পাবেন।' সামিউল জানাল।

ওরা ফরেস্ট বাংলোর সম্মেলন কক্ষে ঢুকল। বেশ বড়সড় কক্ষ। মাঝখানে ওভাল আকৃতির কাঠের টেবিলের চারিদিকে বেশ কয়েকটা চেয়ার। সেই চেয়ার দখল করে জনাপাঁচেক ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে বসে আছেন। তাদেরকে এখন আর খুব একটা ভদ্র দেখাচ্ছে না।

গোয়েন্দা নাভিদকে দেখে আজমল খাঁ-ই প্রথমে মুখ খুললেন। বেশ ভারিক্কি চেহারা। ঝাটা গোঁফ মুখের সঙ্গে খুব মানিয়ে গেছে। 'ভুলটা আমারই হয়েছিল। ওই ঘোড়াটা একটু বেয়াড়া ধরনের। মেজাজ খারাপ হলে পেছন পায়ের লাথি কষায় সেটা ভালোভাবেই জানতাম। কিন্তু ভেবেছিলাম দক্ষ ঘোড়সওয়ারের হাতে পড়েছে। হয়তো বাগে নিয়ে আসতে পারবে। কিন্তু কি হাল হলো দেখুন।'

আজমল খাঁ দায়িত্ব নিয়ে অন্য ঘোড়শিকারিদের পরিচয় করিয়ে দিল। তার ডান পাশে বসে আছে শিকারি মোয়াজ্জেম হোসেন, পেশায় কাঠের কারবারি হলেও ঘোড়সওয়ারে এবং ঘোড়ায় চড়ে শিকারে দক্ষ। তবে কাঠ সংগ্রহের কারণেই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে গাছ দেখতে দেখতে জঙ্গলে ঘোরাটা নেশা হয়ে গেছে।

মোয়াজ্জেমের ওপাশে বসে আছে ইব্রাহিম মোল্লা। নিজেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানী পরিচয় দেন। বিরল প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি-অর্কিডের খোঁজে বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত-যত রকম দুর্গম জায়গা আছে সেসব জায়গায় বেড়ান বলে প্রচার করেন। আড়ালে আবডালে দুর্মুখরা বলে, ইব্রাহিম মোল্লা ভক্ষণযোগ্য বন্য জীবজন্তু ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে সাপ্লাই দেন, যার মধ্যে হরিণ এবং মাইগ্রেটরি বার্ডস অন্যতম। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কড়া আইনের ফাঁকফোকর গলিয়ে বেরিয়ে যেতে তার সমস্যা হয় না।

তারপরে আছে অশ্বিনী কামার। নামের পদবির সঙ্গেই তার ব্যবসা জড়িয়ে আছে। গোলগাল স্বাস্থ্যবান মানুষটির পেশা কামার হলেও এখন আর নিজে হাঁপর ঠেলেন না, তবে লোহা-লক্কড়ের ব্যবসার পাশাপাশি এখনও কামারের দোকান আছে এবং সেখানে দা, বঁটি, শাবল, কোদাল থেকে শুরু করে অনেকরকম লোহার জিনিস বানানো হয়। বাজারে দুর্নাম আছে তিনি নাকি নানারকম হাতে তৈরি চাপাতি, রামদা ইত্যাদি অস্ত্রপাতিও তৈরি করেন।

চতুর্থজন হলেন শখের শিকারি রাজ নারায়ণ রায়। জমিদার বংশের ছেলে। জমিদারি চলে গেলেও শিকারের শখ যায়নি। তবে শখের শিকারি হলেও জীবনধারণের জন্য তাকেও জীবিকার সন্ধানে ছুটতে হয়। আর এ কারণেই তাকে প্রায়শ ঘোড়দৌড়ের মাঠে, জুয়ার আড্ডায় দেখা যায়। তবে ঘোড়ায় চড়ে শুধু শিকার নয়, ঘোড়ার প্রতি তার বেশ দুর্বলতা আছে।

সবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরই নাভিদই আসল প্রশ্নটা করল। ওটা জুয়েলের মনেও ঘুরপাক খাচ্ছিল। 'যে অল্পবয়সি ছেলেটা মারা গেছে ওর পরিচয় কি! ও কেন ঘোড়ায় চড়েছিল।'

আজমল খাঁ-ই উত্তর দিলেন, 'ওর পরিচয় হলো খাঁটি বাংলায় বললে সহিস। ও আমার ঘোড়াগুলোর দেখভাল করত। ঘোড়াকে পোষ মানানো, ঘোড়ার সঠিক পরিচর্যা, ঘোড়ার দৌড় শিখানো, শিকারে নিয়ে যাওয়া এসব কাজই করত ও...'

আজমল খাঁ-র কথা শেষ হওয়ার আগেই যেন নাভিদ বোমা ফাটাল, 'ওই নিরীহ গরিব ছেলেটাকে আপনারা কেন খুন করলেন? তাতে কার কি স্বার্থ হাসিল হলো?'

'মানে?' পুলিশ অফিসার সামিউল অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল।

'মানে সহিস ঘোড়ার লাথির আঘাতে বুক ফেটে নিহত হয়নি। এখানে উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে কেউ একজন খুন করেছে। কী স্বার্থে করেছে তা আমি জানি না। কিন্তু অতি পরিকল্পিতভাবে, কোনো রকম নমুনা না রেখে প্রস্তুত হয়েই ছেলেটাকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু খুনি একটা পয়েন্টে ভুল করে ফেলেছেন।'

উপস্থিত পাঁচজনের মধ্য থেকে একজনের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, 'কী? কী ভুল?'

নাভিদ ক্রুর হেসে সামিউলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে অ্যারেস্ট করুন। নিজের অজান্তেই উনি ধরা দিয়েছেন। যদিও আমি জানতাম খুনি কে!

খুনি মাথা নিচু করে বসে রইল। নাভিদ তার কাছে গিয়ে বলুন, 'এই খুনের পেছনে আপনার মোটিভ কী?'

'একটা ঘোড়া!' অপরাধী উত্তর দিল।

এখন পাঠক বলুন তো খুনি কে? নাভিদ কীভাবে তা বুঝতে পারল?'

হেকিম মুনশির হীরে রহস্য

রোজার দিন। স্কুল ছুটি। শুয়ে-বসে আমাদের আর সময় কাটে না। মুনশি দাদুও রোজা রাখেন বলে ওদের গল্পের আবদার তেমন আর পূরণ হয় না। কারণ দাদুর গল্পের জন্য উপাদান হিসেবে তবক দেয়া পান খাওয়া চাই। রোজা থেকে দাদু তো আর পান খেতে পারেন না! তাই গল্পও আর বেরও হয় না। ইফতারের পরে যে গল্প বলবে সে জো নেই। ইফতারের পরপরই দাদু একটু ঘুমিয়ে নেন। তারপর মসজিদে চলে যান তারাবিহ নামাজ পড়তে। এদিক গল্পের জন্য আমাদের সবার মন আইঢাই করে।

আজকে সবাই মিলে প্ল্যান করলাম দুপুরের পরপরই দাদুকে পাকড়াও করতে হবে। বিকেলে যে করেই হোক দাদুর মুখ থেকে একটা গল্প আদায় করতে হয়। আর দাদুর গল্প তো যে সে গল্প নয়, ও যে দাদুর একেবারে নিজের জীবনের ঘটনা।

জলু বলল, 'পান খেতে না দিলে কি দাদু গল্প বলবে?' প্রশ্নটা অনেকটা স্বগতোক্তির মতো।

ম্যাকু গম্ভীরস্বরে বলল, 'কী করে দাদুর মুখ খোলানো যায় তাই ভাবছি।'

ফজু বলল, 'একটা বুদ্ধি করা যায়। দাদুর জন্য এখনই দোকান থেকে একটা স্পেশাল খিলিপান বানিয়ে আনতে পারি। দাদুর হাতে দেব। দাদু ইফতারের পরে খাবে।'

ডিটু বলল, 'আইডিয়া মন্দ না। আগে পান নিয়ে এসে দাদুকে লোভ দেখাতে হবে। পানের লোভে দাদু একটা না একটা গল্প বলবেই।'

আমি বললাম, 'যদি না বলে! তাহলে দাদুর ওই সুরভি জর্দা দেয়া পান কে খাবে?'

ফজু বলল, 'রিস্ক তো নিতেই হবে। এভাবে ছুটির দিনে শুকনো মুখে বসে থাকা যায় না।'

দোকান থেকে খিলিপান আনার দায়িত্ব আমার ওপরেই পড়ল। তাও একটা

দুটো না, পাঁচ পাঁচটা পান। নিয়ে এসে দেখি ওরা সব দাদুকে ঘিরে দৌলুজ ঘরে বসে গেছে। আমাকে দেখেই দাদু হেসে বললেন, 'তোর জন্যই দেরি করছি। তোরা যে আমার কাছ থেকে গল্প শোনার জন্য এরকম বুদ্ধি ফেঁদেছিস তা বুঝতে পারিনি। তাহলে শোন একটা বুদ্ধির গল্প।'

'গোয়েন্দাগিরি?'

'আরে, শোনই না। তখন আমার বয়স মোটামুটি ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। কাজের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি। এর আগে কিছুদিন এক হাসপাতালে ওয়ার্ড বয়ের কাজ করেছি। কিন্তু হাসপাতালের অসুস্থ পরিবেশ আমার আর ভালো লাগছিল না। অন্য কোনো কাজ খুঁজছিলাম। এর মধ্যে হাসপাতালের সুস্থ হওয়া এক ধনাঢ্য রোগীর সঙ্গে আমার বেশ ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে যায়। আমি কাজ খুঁজছি শুনে ক্ষীতিশ নারায়ণ বাবু আমাকে তার হীরের দোকানের সেলসম্যানের চাকরি দেয়। ক্ষীতিশ বাবু নিজেই দোকান সামলাতেন। কারণ ওনার কাছে অনেক মহামূল্য হীরে ছিল, যা তখনকার দিনে আর কারো কাছে ছিল না। তাই দোকানে আরেকজন কর্মচারী থাকলেও কাস্টমার এলে হীরে দেখানোর কাজটা ক্ষীতিশবাবু নিজেই করতেন। আমাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিলেও তা ছিল দোকানের কাস্টমারদের কেউ হীরে দেখানোর ফাঁকে আসল হীরে গাপ করে নকল হীরে গছিয়ে দেয় কিনা এটার দিকেই নজর রাখা।'

'দাদু, এর মধ্যে বুদ্ধির গল্প আসছে কই? হীরে কি চুরি হয়েছিল?' ডিটু জিজ্ঞেস করল।

'আসছি সে কথায়। হীরে কেনা- বেচাতে দিনকাল ভালোই চলছিল। আমরা কর্মচারী দুজনও মোটামুটি কাস্টমারের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখি। তারপর কাস্টমার থাকা অবস্থাতেই অবিক্রিত হীরেগুলো আয়রন সেফে তুলে রাখি। তো ঘটনা যেদিন ঘটল সেদিনও ক্ষীতিশবাবুসহ আমরা দুজন কর্মচারীই দোকানে। সারাদিনই প্রায় দোকানে কোনো খদ্দের আসেনি এক প্রকার বলা চলে। যা-ও দুএকজন এসেছে, তারা দেখেশুনে না কিনেই চলে গেছে। ঠিক সন্ধ্যের আগে আগে হঠাৎ করে দোকানে একসঙ্গে তিনজন কাস্টমার এসে ঢুকল। আমরাও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। কারণ বেশি কাস্টমার এলেই ঝামেলাটা বেশি বাধে। একজন ক্ষীতিশবাবুর পুরোনো কাস্টমার মিস্টার জয় ঘোষাল। তার মেয়ের বিয়ে তাই একটা মূল্যবান হীরে দেখতে চাচ্ছেন। ক্ষীতিশবাবু তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আরেকজন বেশ মোটাগাটা গোঁফওয়ালা রিটায়ার্ড কর্নেল। তিনি এসেছেন তার এক প্রবাসী বন্ধুকে উপহার দেবেন বলে একটা দামি হীরে কিনতে। আরেকজন অ্যান্টিক ব্যবসায়ী সমর মজুমদার। এসেই নিজের কার্ড বাড়িয়ে দিলেন। তিনি বহুদূর থেকে এসেছেন। এই দোকানে প্রাচীন ঐতিহাসিক

হীরের সংগ্রহ আছে শুনেই এসেছেন। তেমন কিছু পেলে নিজের সংগ্রহশালায় রেখে দেবেন।

আমরা তিনজনই তিন কাস্টমারকে তাদের পছন্দসই হীরে দেখাচ্ছি। গ্লাস-টেবিলের উপর একের পর এক হীরে বের করে দেখানো হচ্ছে। কাস্টমাররাও হীরে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। আমরা এর মধ্যে ওদের হাতের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছি। সবাই ভদ্রলোক কাস্টমার, দামি জিনিস কিনবেন, কাজেই তাদের খুব একটা নিষেধ করা যাচ্ছে না। এরই মধ্যে হঠাৎ দোকানের সামনের দরজার ওখানে একজন লোক আমাদের দোকানের কাচের দরজায় জোর ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছেন। বয়স্ক মানুষ। পড়ে গিয়ে উঠতে পারছেন না। ক্ষীতিশবাবু তড়িৎ গতিতে কাউন্টার থেকে বেরিয়ে বয়স্ক লোকটাকে টেনে তুলে দোকানের বেঞ্চিতে বসালেন। একটু সেবা-শুশ্রূষাও হলো। লোকটা একটু সুস্থির হতেই কাউন্টারের পেছনে চলে এসেছেন ক্ষীতিশবাবু। আমরা দুজনও গোলমালের সময় স্বাভাবিকভাবেই ওদিকে তাকিয়েছিলাম। এর মধ্যেই খুব দামি একটা হীরে উধাও। হীরেটার সাইজ বড় কাবলি ছোলার মতন। ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। ওটা এক দেবমন্দিরের দেবতার তৃতীয় নয়নের মণি হিসেবে বসানো ছিল।

ক্ষীতিশ বাবু দীর্ঘদিনের হীরে ব্যবসায়ী। কাজেই এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হয় তার জানা আছে। তিনি সরাসরি কাস্টমারদের হীরে হারানোর জন্য দায়ী করলেন। স্বভাবতই সবাই অস্বীকার করল। রিটার্য়াড কর্নেল তো একেবারে ক্ষেপে-টেপে গিয়ে মানহানির মামলা করবেন জানালেন। কিন্তু ক্ষীতিশবাবু বুঝিয়ে বলতেই তিনি শান্ত হলেন।

ক্ষীতিশবাবু দোকান সাময়িক বন্ধ করে দিয়ে পুলিশে খবর দিলেন। ওদেরকে সসম্মানে দোকানের ভেতর বসিয়ে রাখা হলো। এমনকি ক্ষীতিশবাবু ওদের সময় কাটানোর জন্য পান-সিগারেট অফার করলেন। মিস্টার জয় ঘোষাল পানাসক্ত। তিনি পানের বাটা থেকে পান তুলে মুখে দিয়ে আঙুলের ডগায় চুন নিলেন। কর্নেল প্রথমে অফার অস্বীকার করলেও পুলিশ আসতে দেরি হচ্ছে দেখে একটা ফিল্টার সিগারেট তুলে নিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। তারপর চিন্তিত ভঙ্গিতে মিলিটারি কায়দায় দু নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। সমর মজুমদারও সিগারেট ধরালেন। মুখ বন্ধ করে এক নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। তাকে বেশ নিশ্চিন্তই দেখাচ্ছিল। পুলিশ এসে ভদ্রভাবেই অনুমতি নিয়ে তিনজনকেই দাঁড় করিয়ে বডি সার্চ করল। কিন্তু কারোর কাছেই হীরেটা পাওয়া গেল না। এমনকি কর্নেলের মাথার হ্যাট, পায়ের জুতো সব খুলে তার মধ্যে তন্ন তন্ন করে সব দেখা হলো। মুহূর্তের মধ্যে হাতসাফাই করে হীরেটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তা পুলিশ ধরতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো, সম্ভবত

হীরেটা গিলে ফেলে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে পেটের মধ্যেই থাকা সম্ভব। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্সরে করে কিংবা স্ক্যানার দিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। আর তার হাঙ্গামাও অনেক।
পুলিশ এক প্রকার হাল ছেড়েই দিল। কারণ এরকম তিনজন সম্মানিত ব্যক্তিকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে এক্সরে বা স্ক্যান করিয়ে কিছু না পাওয়া গেলে পুলিশেরই বদনাম হবে। পুলিশ উল্টো ক্ষীতিশবাবুকেই ধমক দিয়ে এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি না করতে বলল।
পুলিশ চলেই যাচ্ছিল। তখনই চট করে একটা ব্যাপার আমার মাথায় খেলে যায়। জিনিসটা আগে নজরে এলেও ওভাবে ভাবিনি বলে বুঝতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, আমার ধারণাই ঠিক। হীরে চোর কে, আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। এবং চোর হীরেটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তাও বুঝে ফেলেছি। আমি ক্ষীতিশবাবুকে ডেকে ফিসফিস করে কানে কানে সেই কথাই বললাম। ক্ষীতিশবাবু পুলিশকে জানাল। আর পুলিশের সার্চেই বমাল চোর ধরা পড়ল।

এখন, তোরা তো গল্পটা শুনলি। এই গল্পের মধ্যেই চোর ধরার ক্লু আছে। বল তো দেখি, চোর কে? আমি কীভাবে সেটা বুঝতে পারলাম? চোর হীরেটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল?
আমরা সবাই মাথা চুলকাতে লাগলাম।

মূর্তি উধাও

রাশেদ রাহা বিরক্ত মুখে গোয়েন্দা কার্যালয় থেকে বের হলো। এই কেসের সুরাহা করতে না পারার কারণে বড় কর্তার কাছে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য শুনতে হয়েছে। মাথায় ঘিলুর পরিবর্তে অন্য কোনো পদার্থের উপস্থিতি আছে কিনা তাও নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, শেষমেশ এই বলেছেন, 'তোমার কোন সবজান্তা গোয়েন্দা পঙ্গু দাদু আছে, আর কিছু না পারলে তার ধামা ধরো গিয়ে।'

রাশেদ রাহা জ্যোতির্ময় দাদুর কাছে আসতে চায়নি। কেসটা সহজ বলেই নিজ মগজাস্ত্রে শান দিয়ে সলভ করা যায় কিনা দেখতে চেয়েছে। বাড়ির সম্ভাব্য সন্দেহভাজন সবারই সাক্ষাৎকার নিয়েছে, জেরা করেছে, কিন্তু তাতে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরে রয়ে গেছে, প্রকৃত অপরাধী যে কে, তার কিছুই সে বুঝতে পারছে না।

রাশেদ রাহা বাইক চালিয়ে জ্যোতির্ময় দাদুর বাড়িতে চলে এলো। কেয়ারটেকার সেলিমের কাছে ফোন করে আগেই জেনে নিয়েছিল দাদু বাড়িতে নাকি হাসপাতালে? এই বয়সে জীবনের কিছুটা সময় বাড়িতে কাটলেও দাদুর বেশিরভাগ সময় হাসপাতালেই কাটে।

শীতের শেষ, বসন্তের শুরু। দাদু লনে বসে বই পড়ছেন। সামনে বেতের চেয়ারটেবিল। ট্রেতে টি পট, বিস্কুট, দুটো চায়ের কাপ। গোয়েন্দার নজর, দেখেই বুঝে ফেলল, তার আসার কথা শুনে আগেই আরেকটা চায়ের কাপ আনিয়ে রেখেছেন।

'কী ব্যাপার, ওরকম গোমড়ামুখে কেন? বসের বকা খেয়েছিস? নতুন কোনো কেসের ঝামেলা?'

দাদু বইয়ের পাতা মার্কিং করে রাখলেন। রাশেদ বইয়ের কভার দেখতে পেল, জেরুজালেমের ইতিহাস। এই বয়সেও জেরুজালেমের ইতিহাস জানতে হবে কেন, রাশেদ বুঝতে পারল না।

'পড়ার কোনো বয়স থাকে না রে। জানার কোনো শেষ নাই।' দাদু মুচকি হাসলেন। 'নে, আগে চা পান কর। তারপর ঠান্ডা মাথায় তোর কাহিনি শুনি।'

চা পান শেষে রাশেদ রাহা জানাল, 'মক্কেল মনি মোহন সাহা মোটামুটি ধনাঢ্যই বলা চলে। কাপড়ের ব্যবসা আছে। বেনারসি মার্কেটে দোকানও আছে। পাইকারি বেচাকেনা হয়। ঘটনার সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কিসের সম্পর্ক আছে কিসের নেই, তোর কিছু বলা লাগবে না। তুই সবকিছুই বলে যা। ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া ঘটনা পরিষ্কার হয় না। '

'ব্যবসায়ী মনি মোহন সাহার কাছে একটা গণেশ মূর্তি আছে। বাপদাদার আমলের। মূর্তিটা তাদের ব্যবসা লক্ষ্মী হিসেবে ধরা হয়। দামি মণিমানিক্য বসানো মূর্তিটা দোকানের একটা আয়রন সেফের মধ্যে রাতের বেলা রেখে আসা হয়। সকালে আবার মূর্তির স্থানে বসে পূজা দেয়া হয়। এভাবেই চলছিল এতদিন। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে বিভিন্ন মার্কেটে চুরির ঘটনায় মনি মোহন সাহা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এমনকি আশপাশের দোকানদাররা যারা মনি মোহন সাহার বন্ধুস্থানীয় এবং গণেশ মূর্তির দুষ্প্রাপ্যতা ও অর্থমূল্যের ব্যাপারটা জানেন তারা তাকে জানান, 'দোকানে ওভাবে রাতের বেলায় গণেশ মূর্তি রেখে যাওয়াটা এখনকার জন্য ঠিক নিরাপদ মনে হচ্ছে না। আপনি ওটা রাতের বেলায় বাড়িতে নিয়ে রাখলে ভালো হয়। তাতে মূর্তিটাও নিরাপদ থাকে, আপনার দোকানের ওপরে হামলাও হয় না।'

'কিন্তু ওটা তো আমার ব্যবসালক্ষ্মী।' মনি মোহন সাহা দোনামোনা করেন।

'তাতে কি! রাতে তো আর ব্যবসা হচ্ছে না। ব্যবসার সময় ওটা দোকানে থাকলেও তো লক্ষ্মী আসছে।'

যুক্তি ও ভয়ের কাছে মনি মোহন সাহা হার মানেন। সেদিনই ঠিক করলেন, রাতে বাড়িতে যাওয়ার আগে মূর্তিটা একটা কাঠের বাক্সে ভরে কোটের পকেটে করে নিয়ে যাবেন। রাতে দোকানপাট বন্ধ করার সময় মনি মোহন সাহা দোকানের কর্মচারী নিরাপদকে বলেন, আজ তুই আমার সঙ্গে বাড়িতে যাবি। রাতে মেসবাড়িতে ফেরার দরকার নেই। আমার বাড়িতেই থাকবি। নিচতলার ঘরে শুবি।'

কর্মচারী নিরাপদ ঘাড় নেড়ে সায় জানায়। তারপর মনি মোহন সাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যাওয়ার পথটুকু এক প্রকার গার্ড দিয়েই বাড়িতে আসে। এই প্রথম মনিবের বাড়িতে নিরাপদের শুতে আসা। তার একটু অস্বস্তিই লাগে।'

'বাড়ির সমন্ধে একটু ডিটেলস কী বলতে পারবি?'

'জি দাদু, বলছি। মনি মোহন সাহার বাড়ি দোকান থেকে হাঁটাপথের

দূরত্বে। প্রাচীন আমলের দোতলা বাড়ি। লোহার গেট আছে। গেটে দারোয়ান থাকে। ভদ্রলোক বিবাহিত। স্ত্রী বাড়িতে থেকেই ধর্মকর্ম করেন। এক সন্তান। রামমোহন কলকাতায় স্ত্রী পুত্র নিয়ে থাকে। বড় বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করে। বাড়ির অন্য বাসিন্দারা হলো মনি মোহনের বোনের ছেলে শংকর মোহন। অবিবাহিত। মামার বাড়িতে থেকে একটা এনজিওতে চাকরি করে। শোবার ঘর দোতলায় পশ্চিম প্রান্তে। কিছুটা সঙ্গদোষ ও হাতটানের স্বভাব আছে। এর আগে মামির একটা গলার হার বিক্রি করে দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মদ পান করেছে বলে খবর বের করেছি। বাড়ির একজন কেয়ারটেকার, নাম নিখিল ভদ্র। বয়স্ক মানুষ। তিন কুলে কেউ নেই। অনেক দিন ধরেই এই বাড়িতে কাজ করে। শোয় নিচতলায়। মনি মোহনের ছোট শালাও বোনের কাছে থাকে। বিপত্নীক। বেকার। খেলাধুলা, গানবাজনা, পত্রপত্রিকা পড়া এসবেই সময় কেটে যায় তার। হাতখরচ বোনের কাছ থেকে পায়, যদিও টুকটাক সিনেমায় যাওয়া বা গানের শোতে যাওয়া ছাড়া তার তেমন হাত খরচ নেই। কোনো হাতটান না থাকলেও বোনের সংসারে বেকার পড়ে থাকার এক ধরনের বিতৃষ্ণা তার মধ্যে কাজ করে। নিজের মতো করে থাকে বলেই অধিকাংশ সময় তাকে চিলেকোঠার ঘরে থাকতে দেখা যায়। সেখানেই গানবাজনা নিয়ে থাকে। তবে দোতলার পূর্ব দিকের ঘরে মাঝে মাঝে আসে বলে চিলেকোঠা থেকে দোতলায় আসার মধ্যে কোনো গ্রিল নেই। দোতলার পূর্ব দিকের ঘরটা অতিথি রুম হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। বয়স্ক কাজের মহিলা ঝর্না বাড়ির রান্নাবান্নার দিকটা দেখে। সেও পুরোনো। মনি মোহনের স্ত্রীর সঙ্গেই তার বাপের বাড়ি থেকে এসেছে। স্বামী মৃত। সন্তানরা দেখভাল করে না। থাকে নিচতলায়।

'এখন মনি মোহন বাবুর গণেশ মূর্তি নেয়ার ঘটনাটা বল।'

'সে কথাতেই আসছি। মনি মোহন সাহা সাবধানে মূর্তিটা বাক্সে ভরে বাড়িতে নিয়ে এলেন। ওটাই গণেশ মূর্তির নকশা করা কাঠের বাক্স। বাপদাদার আমলের। বাড়ির সকলেই চেনে। তিনি যখন বাক্সটা কোটের পকেটের মধ্যে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন তখনই দারোয়ানের চোখ গেল বাক্সের দিকে। মনি মোহন সাহা নিজেই দারোয়ানকে বললেন, 'বাক্সে গণেশ মূর্তি আছে। বাড়িটা সাবধানে পাহারা দিও। ঘুমালে চলবে না।' তারপর দোতলায় ওঠার সময় কেয়ারটেকারের সঙ্গে দেখা হলো। কেয়ারটেকার বলল, 'বাবু ব্যবসা লক্ষ্মীকে বাড়িতে নিয়ে এলেন কেন?' দোতলায় দাঁড়িয়ে ভাগ্নে কেয়ারটেকারের সঙ্গে মামার কথোপকথন স্পষ্ট শুনতে পেল। আর বাক্সটা কোটের পকেট থেকে উঁকি দেয়ায় দেখতেও পেল। মামা দোতলায় উঠতে সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরে

ঢুকে দেখে ভাইবোন তাস পেটানো হচ্ছে। তখনও দান শেষ হয়নি বলে শালাবাবু ঘর থেকে বের হলো না। মনি মোহন সাহা বাক্সটা কোটের পকেট থেকে বের করে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বললেন, ‘চোর-ডাকাতের ভয়ে জিনিসটা বাড়িতে নিয়ে এলাম। এখন নিরাপদে থাকলেই হয়।’
শালাবাবু ঠাট্টা করে বলল, ‘চোর ডাকাত কোথায় নেই জামাইবাবু! চোরের ভয়ে জিনিস কোলে কে বা বসে থাকে?’
‘মোটকথা বাড়ির সবাই গণেশ মূর্তি বা মূর্তির বাক্সের ব্যাপার জানে?’ জ্যোতির্ময় দাদু জিজ্ঞেস করলেন।
‘হ্যাঁ, তা বলা যায়। রাঁধুনির কাছে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, সেও জানত। রাতে ঘরে খাবার দেয়ার সময় সে টেবিলের উপর মূর্তির বাক্সটা দেখেছে। মনি মোহন সাহা মাথার কাছের বেডসাইড টেবিলে বাক্সটা রেখে দিলেন। পরদিন সকালে মনি মোহন সাহা ঘুম থেকে উঠে দেখেন, বাক্স উধাও। কেউ বাক্স চুরি করে নিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে একটা কথা জানিয়ে রাখি, ছোটবেলায় একবার মনি মোহন সাহাদের পৈত্রিক বাড়িতে আগুন লাগে। সে সময় তিনি ঘরের মধ্যে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে বসে ছিলেন। আগুনের ভয়াবহতায় দরজার ছিটকিনি খুলতে পারেননি। শেষে বাইরে থেকে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করা হয়। সেই ঘটনার পর থেকে বাকি জীবন তিনি কখনও ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করেন না। স্বামী-স্ত্রী শুধু অভ্যস্তই নয়, বাড়ির সকলেই ব্যাপারটা জানে। আর দরজা খোলা থাকার কারণে চোরের পক্ষে ঘর থেকে জিনিসটা হাতিয়ে নেয়া খুব সহজ হয়েছে।’
‘দরজা কি ভালোভাবে ইন্সপেকশন করেছিলি?’ দাদু প্রশ্ন করলেন।
‘হ্যাঁ, দাদু। দরজা যে খোলা ছিল এই তথ্য তখন জানতাম না। তাই ভালোভাবে ইন্সপেকশন করে মনে হয় কেউ লোহার পাতের মতো শক্ত একটা কিছু দিয়ে দরজার ফাঁকে ঢোকানোর চেষ্টা করেছে। সেখানে আঁচড়ের দাগ পাওয়া গেছে। আর দারোয়ান এ ব্যাপারটা নিশ্চিত করেছে রাতে বাইরে থেকে কোনো লোক ভেতরে ঢুকতে পারেনি। সে সজাগ ছিল। পাঁচিল টপকে ঢোকার কোনো পায়ের ছাপ বা বাড়ির গ্রিলে কোনো আঘাত পাওয়া যায়নি। চুরিটা বাড়ির ভেতরের লোকদের মধ্যে কেউ করেছে।’
দাদু হেসে ফেললেন। ‘তোর কেসটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। জলবৎ তরলং! চোর কে তাও বুঝতে পারছি। কীভাবে চোর ধরলাম তাও বলে দিচ্ছি। এখন গিয়ে শুধু পাকড়াও করার অপেক্ষা।’

পাঠক, বলুন তো, কে গণেশ মূর্তি চুরি করেছে। জ্যোতির্ময় দাদু কী করে তা বুঝতে পারলেন।

মিউজিয়াম রহস্য

কারো বাড়ির মধ্যে যে এত বড় মিউজিয়াম করা সম্ভব, তা নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না নয়ন। কিন্তু ওই যে কথায় বলে না, শখের তোলা লাখ টাকা। গোয়েন্দার ছদ্মবেশে চোর ধরার জন্য নয়নকে এখন এই মিউজিয়ামওয়ালা বাড়িতেই থাকতে হবে। ধনাঢ্য জাবের চৌধুরীর বাড়িতে সেই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়েই নয়ন এসেছে।

বিপত্নীক নিঃসন্তান জাবের চৌধুরী একাই থাকেন। মিউজিয়াম ঘিরে থাকে কয়েকজন চাকরবাকর এবং কয়েকজন কর্মচারী। বিশাল দোতলা বাড়িটার নিচতলা পুরোটাই মিউজিয়াম। জাবের চৌধুরী একাই থাকেন দোতলায়। মিউজিয়ামের কর্মচারী ও চাকরবাকররা নিচতলার মিউজিয়াম সংলগ্ন কয়েকটা ঘরে থাকে। সেই মিউজিয়ামে কত রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত সংগ্রহ যে আছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। কোনো কোনো সংগ্রহ আদিম আমলের, হাজার বছর আগেরকার। এই সব সংগ্রহের পেছনে ভদ্রলোক লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন। এখন এই মিউজিয়াম থেকে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে গেছে। পাল বংশের সময়কার একটা গণেশ মূর্তি। মূর্তিটা একটা দামি পাথর খুদে তৈরি করা ছিল।

মূর্তি চুরির সুরাহা করার জন্যই নয়ন ছদ্মবেশে এই বাড়িতে এসে ঢুকেছে। তাছাড়া একটা মূর্তি চুরি হয়েছে বলেই আশঙ্কা থেকে যায়, চোর ধরা না পড়লে আরো চুরি হবে। তবে পারসোনাল অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে যোগ দিলেও নয়নের আসল কাজ চাকরবাকর ও কর্মচারীদের ওপরে নজর রাখা। ধারণা করা হচ্ছে, ওদের মধ্য থেকেই কেউ চুরিটা করেছে। কারণ এই ব্যক্তিগত মিউজিয়াম সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট দিন ছাড়া উন্মুক্ত থাকে না। কাজেই বাইরের কারোর চুরির তেমন সুযোগ নেই। আর রাতের অন্ধকারে বাইরে থেকে চোর এসে চুরি করেছে, এরকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র গণেশ মূর্তি লাপাত্তা।

রাশভারি জাবের চৌধুরী গমগমে গলায় বললেন, 'তোমাকে আমার পিএর কাজ দিলেও তা তেমন না করলেও চলবে, তোমার আসল কাজ হবে গোয়েন্দাগিরি।'

'জানি। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি কি আপনার কর্মচারীদের কাউকে সন্দেহ করেন?'

'কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।' গোয়েন্দার ডায়ালগটা তিনিই বললেন, 'তবে বাইরের দর্শকও যে আসে না তা নয়। ছোট্ট মূর্তি সরাতে তেমন বেগ পেতে হয় না।'

'কর্মচারীদের কোনোরকম সার্চ বা জেরা কি করা হয়েছে?'

'না। তা করা হয়নি। ওরা বিশ্বস্ত। আন্দাজে সন্দেহ করলে ওদেরকে অপমান করা হয়। সেজন্যই তো তোমাকে ডাকা।'

'ওদেরকে একসঙ্গে কখন পাওয়া যায়?'

'সাধারণত সারা দিনের কাজ শেষে বিকেল পাঁচটার দিকে ওদের সঙ্গে চায়ের টেবিলে বসে কাজের কথা হয়।'

চায়ের টেবিলেই মিউজিয়ামের চারজন কর্মচারীর সঙ্গে নয়নের পরিচয় হলো। চারজনই মধ্যবয়সি। মিউজিয়ামের শুরু থেকেই আছেন। মিউজিয়ামের কোনো ক্ষতির কথা যেন এরা কল্পনাও করতে পারেন না। মিউজিয়ামের চারজন কর্মচারীর মধ্যে দারোয়ান গফুর নায়েক চায়ের টেবিলে তেমন হাজিরা দেয় না। কারণ তাকে মিউজিয়ামের দেখভাল করতে হয়। বাকি তিনজন অর্থাৎ রায়হান, সাকির ও প্রণব চায়ের টেবিলে হাজির।

চায়ের টেবিলের টুকটাক কথাবার্তা শেষ হলে নয়ন বলল, 'স্যার, আজকে একটা ঘটনা ঘটেছে। বিকেলের দিকে বাইরে বেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকেছিলাম। ওখানে একজন বেশ পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো। আমি আপনার ওখানে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছি দেখে উনি ইতস্তত করার পরে একটা কথা বললেন।'

'কী কথা?' জাবের চৌধুরী জানতে চাইলেন। বাকি তিন জোড়া চোখও আমার ওপরে নিবদ্ধ।

'বললেন, আপনার মিউজিয়ামের মহামূল্য জিনিসের ওপর অনেক শৌখিন মানুষের লোভ আছে। এ একটা জিনিসের জন্য তারা লাখ লাখ টাকা খরচ করতে রাজি। সেরকম কয়েকজনের সঙ্গে তার চেনাজানা আছে। আসলে তিনি ওই মিডলম্যানের কাজই করেন। আমি যদি দু-একটা জিনিস এনে দিতে পারি, তাহলে নাকি আমার আর এখানে চাকরি করা লাগবে না...ইত্যাদি...ইত্যাদি। তারপরই উনি আমাকে ওনার নাম, ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিয়ে সুযোগ সুবিধে বুঝে যোগাযোগ করতে বললেন। ওনার

নাম আবু তাহের, ২৪/৩ শান্তিনগর, আর এই যে স্যার ফোন নাম্বার ০১৭১১...৩৪৪...'

জাবের চৌধুরী ফোন নাম্বারের শেষ ডিজিট পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাকির বলে উঠল, 'স্যার, আমাকে একটু উঠতে হচ্ছে। একটা জরুরি কাজ মনে পড়েছে। আপনারা বসুন...' সাকির উঠে বেরিয়ে গেল।

তারপর একে একে সবাই বেরিয়ে গেলে নয়ন জাবের চৌধুরীকে জানাল, 'স্যার, আপনার মূর্তি চোর কে, তা বের করে ফেলেছি। এখন পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিন। জিনিস পেয়ে যাবেন।'

এখন পাঠক বলুন তো, মূর্তি চোর কে? নয়ন কী করে তা বুঝতে পারল?

হত্যা না আত্মহত্যা?

দুশ্চিন্তায় গোয়েন্দা রাশেদ রাহা এতটুকু হয়ে গেছে। বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট গোফরান আলীর হত্যারহস্যের এখনও কোনো কিনারা হয়নি। পত্রিকার পাতাগুলো পুলিশ গোয়েন্দাদের তুলোধুনা করে ছাড়ছে। সাংবাদিকরা বলছে এটা হত্যা, আত্মহত্যা হতেই পারে না! যে মানুষ আগের দিন সংবাদ সম্মেলন করে তার পরবর্তী প্রজেক্ট নিয়ে ঘোষণা দিতে পারে, সে মানুষ সেই রাতেই আত্মহত্যা করতে পারে না। কিন্তু পুলিশের ধারণা, এটা আত্মহত্যা। আত্মহত্যার সব নমুনাই সেখানে পাওয়া গেছে। আর আত্মহত্যা না হলে ভুলবশত গবেষণাগারের গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় তিনি মারা গেছেন। তারপরও পুলিশ নিশ্চিত হওয়ার জন্য তদন্তটা পুলিশের গোয়েন্দা রাশেদ রাহার কাছে দিয়েছে। কিন্তু রাশেদ রাহাও কোনো কূলকিনারা করতে পারেনি। বাধ্য হয়েই এসেছে সবজান্তা জ্যোতির্ময় দাদুর কাছে।

কিন্তু সেখানেও ঘাপলা। দাদু বাড়িতে নেই। একজন হুইল চেয়ারে বাস করা মানুষ নিশ্চয় বেড়াতে যেতে পারে না। বাড়িতে কেউ নেই। চাকরবাকররাও উধাও। এখানেও কোনো কিছু হয়ে গেল নাকি! দাদুকে হত্যা করে চাকরবাকররা বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নিয়ে কি পালিয়ে গেল? রাশেদ রাহা বুঝতে পারল, এভাবে লনে বাইকের উপর বসে সময় কাটালে কোনো সমাধান হবে না। আগে জ্যোতির্ময় দাদুকে খুঁজে বের করতে হবে। রাশেদ দাদুর এক তলা বাড়ির চারপাশে ঘুরে এলো। চারদিক থেকে দরজা জানালা বন্ধ। মূল দরজায় বড় তালা ঝুলছে। বন্ধ জানালা দিয়ে ভেতরে দেখে তেমন কোনো অসংগতিই বুঝতে পারল না। সব কিছুই ঠিকঠাক আছে বলেই মনে হয়। তখনই মনে পড়ে গেল, সায়েন্টিস্ট গোফরানের বাসাও এরকম ছিল। ভেতর থেকে সব কিছুই বন্ধ। তার মধ্যেই ছিলেন গোফরান আলী। বাইরে থেকে কেউ ভেতরে আসেনি। অথচ গোফরান আলীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঘরটা গ্যাসের গন্ধে দম আটকা ছিল।

গোফরান আলী শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে। পুলিশের ধারণা, আত্মহত্যার উদ্দেশ্যেই গোফরান আলী নিজেই গ্যাসের পাইপের গ্যাস বার্নারের গ্যাসের চুলার চাবি খুলে রেখেছিলেন।

রাশেদ রাহা এই বন্ধ বাড়িটার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তদন্তের কোনো সুরাহা করা যায় কিনা ভাবতে লাগল।

এমন সময় বাইরের লনে কারোর গলা শোনা গেল। হয়তো রাশেদের মোটরবাইকটা দেখেই কেউ কিছু বলছে। বাড়ির পেছন দিক থেকে রাশেদ লনে এলো। কেয়ারটেকার জগন্নাথ এসেছে। রাশেদকে দেখেই বলল, 'স্যার, আপনি কখন এসেছেন?'

'এই তো বেশ কিছুক্ষণ? দাদুকে দেখছি না কেন? পা কি ভালো হয়ে গেল নাকি?'

'না স্যার। কর্তার হঠাৎ করে একটু শরীর খারাপ হয়েছে। তাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখনও হাসপাতালে আছে।'

'এখন কেমন আছে? কোন হাসপাতালে?'

'এখন একটু ভালো আছে। স্যার, দেখা করতে যাবেন?'

রাশেদ আর দেরি না করে মোটরসাইকেলে উঠে পড়ল।

হাসপাতালের কেবিনে দাদু আধশোয়া হয়ে আছে। পিঠের নিচে বালিশ দেয়া। হাতে যথারীতি বই। তবে এবার আর কোনো ভারিক্কি ধরনের বই নয়। শিবরাম চক্রবর্তীর 'হর্ষবর্ধন গোবর্ধন।' দাদুর মুখে প্রশস্ত হাসি।

বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'কিরে আমাকে বাড়িতে না পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এখানেই ছুটে এসেছিস!'

রাশেদ একটু কাঁচুমাচু স্বরে বলল, 'আসলে আপনার অসুস্থতার খবর জানতাম না, তাই বাড়িতেই গিয়েছিলাম।'

'হু, বুঝেছি কেসের ব্যাপারে। কী কেস?'

'তার আগে বলুন আপনার কী অসুখ?'

'অসুখ আর কি! বুড়ো বয়সের রোগ। বার্ধক্যজনিত অসুখ।' দাদু হেসে বললেন, 'আমার অসুস্থতা নিয়ে তোর চিন্তা করতে হবে না। এই বয়সে এরকম একটু আধটু হয়। না হলে যে মরণের কথা মনে থাকে না। অসুস্থতা মানুষকে মরণের কথা মনে করিয়ে দেয়।'

'কী যে অলুক্ষণে কথা বলেন না দাদু!'

'এখন তুই বল কেসটা কী? আবার কী ঝামেলা পাকিয়েছিস?'

'হত্যা না আত্মহত্যা– এরকম একটা কেস। তদন্তের ভার আমার ওপরে। কুলকিনারা পাচ্ছি না।'

'ও, বিজ্ঞানী গোফরান আলীর আত্মহত্যা রহস্য! পত্রিকায় পড়েছি। কি নাকি গ্যাসের প্রভাবে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে।'

'জি দাদু ওটাই।'
'ঘটনাটা কী খুলে বল তো! পত্রিকায় তো আর তেমন ডিটেইলস কিছু লিখেনি। আর তোদের তদন্তের ব্যাপারে পত্রিকায় তেমন কিছু দেয়ওনি।'
'এটা গোপন তদন্ত। পুলিশ আত্মহত্যা বলে দিলেও আমরা এর পেছনের রহস্য খুঁজছি। শুনুন দাদু, সায়েন্টিস্ট গোফরান আলীর কথা তো আপনি শুনেছেন। ওর নামে কয়েকটা পেটেন্ট আবিষ্কার আছে। সর্বশেষ গ্যাসের চাপ কম রেখে কীভাবে অধিক হারে ব্যবহার করা যায় এরকম একটা বিষয় নিয়ে নাকি গবেষণা করছিলেন। সে কারণেই ওর গবেষণাগারে কয়েকটা সিলিন্ডার এবং গ্যাসের পাইপের মুখ সবসময় খোলা থাকত।'
'গ্যাসের পাইপের মুখ খোলা থাকত? বলিস কী? ওতেই তো অ্যাক্সিডেন্ট...'
'না, দাদু, ওগুলো খোলা থাকলেও গোফরান আলী সবসময়ই মেইনলাইনের উপরের দিকে ঘোরানোর বড় তারকা আকৃতির ককটা বন্ধ করে রাখতেন। যখন গ্যাসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কাজ করতেন তখনই শুধু ওটা খুলে দিতেন। কারণ ল্যাবরেটরিতে ওনার এই প্রজেক্টে অনেকগুলো গ্যাসের পাইপ লাইন আর সিলিন্ডার নিয়ে কাজ করতে হতো। একটা একটা করে বন্ধ খোলা করতে গেলে অনেক সময় লেগে যেত। সে কারণেই এই ঝামেলায় যেতেন না। তবে রাতের শোবার আগে কখনও মেইন লাইনের কক বন্ধ করতে ভুলতেন না। এমনকি ল্যাবরেটরির লাগোয়া শোবার ঘরটাতে বিছানায় গিয়েও উনি তাও আরেকবার নাকি উঠে গিয়ে মেইন কক বন্ধ করা হয়েছে কিনা সেটাই দেখতেন। এমনটি জানিয়েছেন ওনার খুব কাছের বন্ধুরা।'
'কাছের বন্ধুরা? তাদের সম্পর্কে কি কিছু জানা আছে গোয়েন্দার?'
'জি দাদু। গোয়েন্দাগিরির কারণে সাংবাদিকদের অগোচরেও তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর বের করি। এমনকি প্রয়োজনে জেরাও করতে হয়েছে। ওখান থেকে জানতে পারি, গোফরান আলীর মৃত্যুর আগেও ওনার তিনজন বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন। গোফরান আলীর বাড়ির আশেপাশেই তাদের বাড়ি। রিটায়ার্ড প্রফেসর জামিলুর রহমান গোফরান আলীর বাল্যবন্ধু। অবসর নেয়ার পর শরীরটাকে ঠিকঠাক করার কাজে মেতে উঠেছেন। নিয়মিত জগিং, ব্যায়াম লেগেই আছে। তাছাড়া বাগান করা ওনার শখ। ওনার ভাষ্যমতে, এরকম কোনো কারণ ঘটেনি যে গফু তাতে আত্মহত্যা করতে পারে। তবে গ্যাসের ব্যাপারে দুর্ঘটনা বলেই ওনার মন্তব্য। যদিও গফু খুব সাবধানী। তবে একদিন অসাবধানী হয়ে গেলে তো কিছু করার নেই।
'তারপর থাকে প্রফেশনাল বন্ধু পদার্থবিজ্ঞানী আদিলুর রহমান। নিজ ক্ষেত্রে

তেমন সুবিধা না করে উঠতে পারলেও পত্রপত্রিকা বিদেশি জার্নালে বিজ্ঞান বিষয়ে তার সুচিন্তিত মতামত নিয়মিত ছাপা হয়। বিজ্ঞানসাধনার পাশাপাশি ছিপ বড়শি গেঁথে হুইলে করে মাছ ধরার নেশা আছে আদিলুর রহমানের। বিজ্ঞান সম্মেলনের পাশাপাশি কোথাও মাছের খোঁজ পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে থাকা তার কাছে কোনো ব্যাপারই না। গোফরানের কাজ কারবার কেমন চলছে তা দেখতে নিয়মিত আসতেন। বন্ধুর প্রজেক্ট নিয়ে নানান খুঁটিনাটি আলোচনা হতো। গোফরান আলী অকপটে বন্ধুর সঙ্গে সবই বলতেন। ভেতরে ঈর্ষায় জ্বললেও বন্ধুর সঙ্গে সদ্ভাব ছিল তার। আদিলুর রহমান বলেন, 'এটা ঠিক যে গোফরানের সাফল্যে আমি কিছুটা ঈর্ষান্বিত হতাম। তবে ওর ওসব কাজকারবার আমার খুব একটা পছন্দ হতো না। পছন্দ না হলেও সাপোর্ট করতাম। গ্যাসের এই প্রজেক্টে আমি ওকে আগেই সাবধান করেছিলাম। ওও বলেছিল, দোস্ত, আমার মেইন কক সময়মত বন্ধই থাকে। সেই মেইন কক তো খোলা পাওয়া গেল। ভুল...ভুল...'

'বন্ধু কাম প্রতিবেশী জাফর তালুকদার বিজ্ঞানের তেমন কিছু বোঝেন না। শুধু নামকরা এরকম একজন প্রতিবেশী আছে বলেই বিপদে-আপদে সাহায্য করেন। নিজের বাড়ির কেয়ারটেকার সবুজকে এখানেও কাজ করতে পাঠান। মানুষের সঙ্গে বন্ধুর গল্প করেন। কাপড়চোপড়ের ব্যবসার পাশাপাশি অ্যাকুরিয়ামে মাছ পোষার শখ আছে তার। তার সঙ্গে দেখা করতেই আন্তরিক স্বরে দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আহারে মানুষটা কত ভালো ছিল। মানুষের মঙ্গল ছাড়া কিছুই বুঝত না। এরকম মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে না। আপনারা ভালো করে খোঁজখবর নেন..'

'একজন শিক্ষানবিশ ছাত্রবিজ্ঞানীর কথা উঠে এসেছে না?' জ্যোতির্ময় দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

'ও হ্যাঁ, ওর কথাই আগে বলা উচিত ছিল। একজন ফ্রিল্যান্সার শিক্ষানবিশ বিজ্ঞানী রাহুল রায় গোফরান আলীর ওখানে মাঝেমধ্যে যেত। স্যারের কাজে সাহায্য করত। ঘটনার রাতেও স্যারের ওখানে কাজ করেছে রাহুল। সে নিজ চোখে দেখেছে স্যার তার সামনেই জানালার ধারের গ্যাসের মেইন লাইনের মেইন ককটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়েছেন। তারপর সে চলে এসেছে। সেই স্যার রাতে আবার কক খুলে কাজ করেছেন বলে রাহুলের মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এটা আত্মহত্যা নয়, স্যারকে কেউ সুকৌশলে হত্যা করেছে...'

'আচ্ছা, তুই তো ইন্সপেকশনে গিয়েছিলি? সন্দেহ করার মতো কোনো আলামত কি পেয়েছিস? এই ধর, যেরকম ভেন্টিলেটরের কোথায় কাটা, জানালার কবাট খোলা বা কোনোরকম কিছু?'

'হুমম, তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢোকার কোনো আলামতই পাওয়া যায়নি। বাগানের দিককার একটা জানালার নিচের দিকে কিছু একটা ঘষে নেয়ার দাগ পাওয়া গেছে। লোহার দাগ। কিন্তু তা দিয়ে একটা ছোট শিকের বেশি কিছু ঢুকবে না। শেষ রাতে বৃষ্টি হওয়ায় কোনো পায়ের ছাপও নেই। আর ওনার গায়ে কোনো আঁচড়ের দাগ পাওয়া যায়নি কাজেই...'

জ্যোতির্ময় দাদু হাত উঁচিয়ে রাশেদের কথা থামিয়ে দিলেন। 'হুঁ, আমি বুঝতে পেরেছি ওটা আত্মহত্যা নয় হত্যা! আর কে বিজ্ঞানী গোফরান আলীকে হত্যা করেছে এবং কীভাবে করেছে। আমি তোকে বলে দিচ্ছি তুই গিয়ে ব্যাটাকে ধরে চাপ দে...সব বেরিয়ে আসবে...

পাঠক বলুন তো, কে বিজ্ঞানী গোফরান আলীকে হত্যা করেছে? কীভাবে?

একটুর জন্য

জুয়েল খবরের কাগজ ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখতে রাখতে আপনমনে বিড়বিড় করে বলল, 'গোয়েন্দাগিরি করার মতো একটা খবরও নাই।'
জুয়েল আপনমনে বললেও টেবিলে বসে কিরোর হাত দেখার বই পড়তে পড়তে কথাটা নাভিদের কানে গেল। শুক্রবার। ছুটির দিনে অলস সময় কাটছিল। জুয়েলের ওরকম মন্তব্যের মর্মও বুঝল সে। বেশ কিছুদিন ধরে তাদের হাতে তেমন কোনো কাজ নেই। বেকার বসে থাকতে থাকতে দুজনেই হাঁপিয়ে উঠেছে।
এরকম সময়ই স্থানীয় থানা থেকে ফোন এলো। ওসি রফিকুল ইসলাম; নাভিদের পরিচিত। এর আগে দুটো খুনের ঘটনায় নাভিদ ছায়া তদন্ত করেছে। নাম হয়েছে ওসি রফিকের, কিন্তু রফিক জানে পুরো কৃতিত্বটাই নাভিদের। এই নিয়ে তো বসের ওপর জুয়েল বেশ কিছুদিন খাপ্পা হয়েছিল।
'নাভিদ ভাই, ছোটখাটো একটা খুনের ঘটনা আছে। মনে হয় না তেমন কিছু। তবুও আপনার যদি একটু সময় থাকে তাহলে চলেন যাই। আমাদের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে না, তেমন কিছু হয়তো আপনার নজরে পড়তে পারে। আপনি তাহলে রেডি হয়ে থাকুন, আমি এই আধা ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব।'
নাভিদের চেয়ে জুয়েলের আগ্রহ বেশি। ফোন শেষ হতেই জুয়েল বাথরুমে ঢুকে গেল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফটা কামিয়ে ফেলতে হবে। সে আর এখন ছিঁচকে পকেটমার নয়, গোয়েন্দার সহকারী। গেটআপের একটা ব্যাপার আছে না!
ওসি রফিকের পুলিশের গাড়িতে একজন কনস্টেবল। যেতে যেতে ওসি রফিক পুলিশকে বলল, 'এই পাশের মফস্বল টাউনের ঘটনা। আমিও তেমন ডিটেইলস কিছু জানি না। ওখানে নিজের বন্ধ ফ্ল্যাটে সুমন নামের বছর

ত্রিশের এক যুবক খুন হয়েছে। যুবকটির বন্ধুই এসে থানায় খবর দেয়। আমাদের অন্য ইউনিট লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ফরেনসিকে পাঠায়। ওখানকার লোক বা আমরাও প্রথমে আত্মহত্যাই ভেবেছিলাম। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ছেলেটার পাকস্থলিতে এনড্রিন নামক কীটনাশক বিষের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। কিন্তু কয়েকটা ছোটখাটো ঘটনায় ওটাকে আত্মহত্যার চেয়ে হত্যা বলেই মনে হচ্ছে।'

'কি সেই ছোটখাটো ঘটনা, যাতে আত্মহত্যার চেয়ে হত্যা বলেই মনে হচ্ছে?' নাভিদ জানতে চাইল।

'প্রথম কথা, ওর পাকস্থলিতে বিষের পাশাপাশি মদেরও অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। যে আত্মহত্যা করে সে আর যা-ই হোক, মদ খায় না।'

'আত্মহত্যার মতো ঘটনায় সাহস বাড়াতে মদ খেতে পারে।'

'তা পারে, তবে...চলুন ওখানে তবেই বুঝতে পারবেন।'

মফস্বল শহরের কমদামি ফ্ল্যাট। দারোয়ান-টারোয়ানের বালাই নেই। বাসিন্দাদের কাছে গেটের চাবি থাকে। ফ্ল্যাটের নিচেই থানায় এজাহারকারী সেই যুবককে পাওয়া গেল। তপন। সুমনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওসি দেখেই ছেলেটা বলল, 'স্যার, ও আত্মহত্যা করতে পারে না। ও আত্মহত্যা করার ছেলে নয়। ওকে খুন করা হয়েছে। আপনারা একটু জোর তদন্ত করুন। খুনি বেরিয়ে পড়বে।'

ওসি রফিক বলল, 'ধৈর্য ধরুন, আমরা তো দেখছি। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কিন্তু বিষপানই পাওয়া গেছে।'

ওরা সুমনের ফ্ল্যাটে এলো। ব্যাচেলরের অগোছালো ফ্ল্যাট। নাভিদ ভালো করে ফ্ল্যাটের চারিদিকে দেখল। একটা টালি খাতার মতো খাতা। ব্যবসায়ী সুমনের হিসাবপত্রের খাতা। একটা বইয়ের মধ্যে মেয়েলি হাতের চিঠি। নাভিদ তপনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর কি অনেক টাকাপয়সা ধার দেনা হয়েছিল?'

'জি স্যার।'

'বড় বড় পাওনাদারের নাম ঠিকানা বলতে পারেন?'

'হ্যাঁ, স্যার। এখানকারই ব্যবসায়ীরা। সবার পরিচিত। মনোহরির দোকানের বড়বাবু সুশীল সেন ওর কাছে বড় অঙ্কের টাকা পেত...কদিন ধরে হুমকিধামকি দিয়ে টাকা শোধের আলটিমেটাম দিয়েছিল...'

নাভিদ হাত উঁচিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওর কি কোনো মেয়ের সঙ্গে চক্কর... আই মিন প্রেম ছিল? আপনি তো ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আপনার জানার কথা।'

তপনকে একটু ম্রিয়মাণ দেখাল। ইতস্তত করে বলল, 'জি স্যার, হামিদ শেখের মেয়ে হামিদার সঙ্গে ওর প্রেম। কিন্তু হামিদ শেখ দোকানদার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি নয়, তাই নিয়ে কিছুদিন মনোমালিন্য

চলছিল, এমনকি হামিদ শেখ হুমকিও দিয়েছিল...'
নাভিদ আচমকা প্রশ্ন করল, 'আপনি কী করেন?'
একটু থতমত খেয়ে তপন বলল, 'স্যার, একটা বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করি, আজ এই ঘটনার জন্য যেতে পারিনি।'
'আপনি ছাড়া ওর আর কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে যার সঙ্গে ও সময় কাটায়?'
'বন্ধুবান্ধব তো অনেকেই আছে। তবে দোকানদারি শেষ করে সাধারণত সাজুর ফ্ল্যাটে যায় ও। অনেক সময় ওখানে খেয়ে আসে, রাতও কাটায়। সাজুর ফ্ল্যাটের চাবিও থাকে ওর কাছে। সাজু না থাকলেও ওখানে গিয়ে মদ পান করে।'
'ঘটনার দিন কি ও সাজুর ফ্ল্যাটে গিয়েছিল?'
'তা বলতে পারব না স্যার। তবে পেটে যখন মদ পাওয়া গেছে তখন যেতে পারে, ওই ফ্ল্যাটে গিয়ে ও মদ খেত।'
'আপনি?'
'না স্যার। আমার সাতসকালে ব্যাংকে দৌড়াতে হয়, ওসব পেটে পড়লে হ্যাংওভার হয়ে যায়।'
নাভিদ কি যেন চিন্তা করল। তারপর ওসি রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কয়েকটা ক্লু পেয়ে গেছি। কয়েকজনের সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে। আর ওর সেই মদের বোতল আর এনড্রিনের শিশি এই দুটো খুঁজে বের করে ওই দুটোর গায়ের ফিঙ্গার প্রিন্ট নিতে হবে। আমার মনে হয় তাতেই সমাধান পেয়ে যাব। আমার ধারণা মদের সঙ্গে এনড্রিন মিশিয়েই ওকে হত্যা করা হয়েছে।'
'ঠিক আছে, ব্যবস্থা নিচ্ছি। এখন চলেন কোথায় যাবেন।'
ওরা প্রথমে এলো মনোহরির সুশীল সেনের বড় দোকানে। প্রৌঢ় সুশীল সেন দোকানেই ছিলেন। পুলিশের গাড়ি দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন। ওদেরকে আপ্যায়ন করে ঠান্ডা খেতে দিয়ে বললেন, 'স্যার, সুমনের কাছে টাকা পেতাম সত্যি, তা ব্যবসায় লেনদেন ধার-দেনা হয়েই থাকে। অন্যবার ধার দেনা করলেও মালের টাকা ও সময়মতোই দিত। হয়তো দুএক সপ্তাহ এদিকওদিক হতো। এবারে অনেক দেরি করে ফেলছিল স্যার। তিন মাসের মধ্যেও দেয়নি। তাই একটু রাগারাগি করে আলটিমেটাম দিয়েছিলাম স্যার, অমনটি তো কত ব্যবসায়ীই দিয়ে থাকে...তাই বলে ছেলেটাকে আমি লোক লাগিয়ে হত্যা করব... তাতে আমার লাভ কী? টাকাটাই তো পাব না বরং ও বেঁচে থাকলে...'
নাভিদ কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, 'আপনার নাকি বেনামিতে মদের ব্যবসা আছে, সেখানকার মদই তো সুমনকে দিয়েছিলেন...'
সুশীল বাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললেন,

‘একটু আধটু আছে স্যার, সবাইকে ম্যানেজ করে চলতে হয়, সুমন আমার কাছ থেকেও নেয়, বাকিতে। আগেও নিয়েছে, এবারও নিয়ে গিয়েছিল...’

‘আগের আর এবারের মধ্যে পার্থক্য আছে।’

ওখান থেকে বেরিয়ে ওরা এলো হামিদ শেখের বাড়িতে। হামিদ শেখ এবং মেয়ে হামিদা দুজনেই বাড়িতে আছে। হামিদ শেখ একটু রাশভারি টাইপের মানুষ হলেও সুমনের মারা যাওয়াতে কেমন যেন তবদা মেরে গেছে।

নাভিদ ও ওসি রফিকের জেরার মুখে স্বীকার করল, ‘হুঁ, ওকে আমি বেশ একটু ধমকে দিয়েছিলাম। সোমত্ত মেয়ে বাড়িতে। যখন তখন বাড়ি আসে। মেয়েরও বিয়ের বয়স। ওদিকে ভালো পাত্রও দেখে রেখেছি। ব্যাংকার। মেয়েরও যে খুব বেশি মত তা না। ওই ছেলেটাই জোরজবরদস্তি করত। তাই ওকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তো স্যার মুখে মুখেই।’

ওরা হামিদাকে আড়ালে নিয়ে এলো। প্রেমিকের মৃত্যুতে মেয়েটাকে তেমন শোকার্ত মনে হচ্ছে না। বরং কিছুটা আতঙ্কিত। কি নিয়ে আতঙ্ক ওর?

সুমনের কাছে লেখা হামিদার চিঠিটা বের করল নাভিদ। ‘দেখুন তো এটা চিনতে পারেন কিনা? আপনারই তো হাতের লেখা, তাই না?’

হামিদা চিঠিটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে ভালো করে দেখল। তারপর জোর গলায় অস্বীকার করল, ‘এটা মোটেই আমার লেখা চিঠি নয়। আমার হাতের লেখা নয় এটি।’

নাভিদ হামিদার হাত থেকে চিঠিটা চিমটি দিয়ে নিয়ে ফরেনসিকের পলিপ্যাকে ঢুকাল। ‘মেয়েলি হাতের লেখা দেখে আপনারই ভেবেছিলাম। তাহলে হয়তো অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সুমনের চক্কর চলছিল। তারই চিঠি হবে এইটা।’

সাজুকে পাওয়া গেল না। ওর ফ্ল্যাট তল্লাশি করা হলো। একটা মদের বোতল পাওয়া গেল। কিন্তু এনড্রিনের কোনো শিশি পাওয়া গেল না।

নাভিদ মদের বোতলটা নিয়ে বাইরে এলো। তপন তখনও ওদের সঙ্গে সঙ্গে। নাভিদ মদের বোতলটা তপনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘দেখুন তো এই বোতলের মদের সঙ্গেই কি এনড্রিন মেশানো হয়েছিল?’

তপন বোতলটা হাতে নিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখল। তারপর বলল, ‘কোন বোতলের মদ খেয়েছিল তা আমি কী করে বলব? আমি তো ওইদিন ওর সঙ্গে ছিলাম না।’

নাভিদ আবার ফিরে এলো সুমনের ফ্ল্যাটে। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল ফ্ল্যাট। সেই এনড্রিনের শিশিটা কোথায়?

এনড্রিনের শিশি পাওয়া গেল ফ্ল্যাটের পাশে নিচের ঝোপের মধ্যে। ওসি রফিক তখনই ওটা ফরেনসিকে পাঠিয়ে দিল। হ্যাঁ, ওটার বিষই পাওয়া গেছে সুমনের পেটে। এবং শিশিতে সুমনের কোনো হাতের ছাপ নেই।

তবে একজনের হাতের ছাপ আছে।

এখন পাঠক বলুন তো, সুমনের হত্যাকারী কে? শিশিতে কার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে? নাভিদ কীভাবে তা বুঝতে পারল?

মিসটিক

পূর্ণতার মুখ শুকিয়ে গেছে। স্কুলের মিস্ট্রেস ডেকে জানিয়েছেন, ওর সঙ্গে দেখা করতে নাকি একজন গেস্ট এসেছে। স্কুলের ওয়েটিং রুমে বসে আছে।

কে আসতে পারে? পূর্ণতা ভেবে পায় না।

ওয়েটিং রুমে এসেই পূর্ণতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মিসটিক তমাপ্পি!

পূর্ণতাকে দেখেই তমাপ্পি বলল, 'অ্যাই পূর্ণতা, স্কুল ছুটির পর তোর আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে আপত্তি নেই তো! খালাকে আমি ফোনে বলে নেব।'

'তাহলে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কোথায়?'

'একটা গোয়েন্দাগিরির কেস সমাধান করতে। আমি একাই যেতে পারতাম। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ঘটনাটা ঘটেছে কিনা! কিন্তু তোকে সঙ্গে না নিলে কেমন যেন পানসে মনে হয়। গোয়েন্দার একজন সাগরেদ থাকবে না তাই কি হয়! হোক না সে মেয়ে গোয়েন্দা!'

পূর্ণতা আনন্দে তমাপ্পিকে জড়িয়ে ধরল। তার কিছুক্ষণ বাদেই স্কুল ছুটির ঘণ্টা পড়ল।

তমাপ্পির সঙ্গে যেতে যেতে পূর্ণতা জিজ্ঞেস করল, 'কেসটা কী আপু?'

'আমিও ঠিক জানি না। আমার বন্ধু শ্রীলা আমাকে মোবাইলে কল দিয়ে বলেছে, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমাদের গণেশঠাকুর চুরি হয়ে গেছে। তুই শিগগিরই আয়।'

সিএনজিতে কলাবাগানের লেকসার্কাস রোডে এল তমাপ্পি। অ্যাপার্টমেন্টের নিচে এসে বুঝতে পারল, ঘরোয়া ব্যাপার বলেই বোধহয় শ্রীলারা এখনও পুলিশকে জানায়নি। কারণ আশপাশে কোনো পুলিশকে দেখা যাচ্ছে না।

তমাপ্পির আসার খবরে শ্রীলা নিচে নেমে আসে। তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ফ্ল্যাটে ঢুকে ড্রয়িংরুমে বসল ওরা। শ্রীলার মা শীলা মাসিমা

গণেশ হারানোর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। তিনি গণেশঠাকুর উদ্ধারের আশায় পুজোয় বসেছেন। শ্রীলার ব্যবসায়ী বাবাকে এখনও জানানো হয়নি।

শ্রীলা জানাল, 'কষ্টিপাথরের গণেশ ঠাকুরের মূর্তি। তা প্রায় হাতখানেক লম্বা তো হবেই। চওড়াও আধ হাতের মতো। অনেক ভারী। অন্তত বিশ-পঁচিশ কেজি তো হবেই। ওটা আমাদের পূর্বপুরুষের জিনিস। আমাদের ব্যবসায়ী পরিবারে মূর্তিটির অনেক কদর। কয়েক পুরুষ ধরে হাতবদল হয়ে এখন বাবার কাছে এসেছে।'

'মূর্তিটা কোথায় ছিল?'

'মায়ের ঘরের লাগোয়া ছোট্ট পুজোখানাতেই অন্য দেবদেবীর পটের পাশেই থাকত। পুজোর জন্য ওটা আলাদা একটা ঘর। সপ্তাহে একদিন এসে ঠাকুরমশাই পুজো দিয়ে যেত...'

'আজ কি সেই সাপ্তাহিক পুজোর দিন ছিল?'

'হুঁ, সকালেই ঠাকুরমশাই পুজো দিয়ে বেলফুল পাতা দিয়ে চলে যান। সাগরেদটা তার পিছু পিছু যায়।'

'ঠাকুরমশাইয়ের সাগরেদও এসেছিল?'

'হ্যাঁ। সবসময়ই সঙ্গে ওই চ্যালাটা আসে। বারো-তেরো বছর বয়সের হ্যাংলাপনা কিশোর। ঠাকুরের প্রাসাদের থালি আর ডালা ধরে রাখে।'

'হু। যা বুঝতে পারছি, তাতে মনে হচ্ছে মূর্তি চুরিটা কোনো ছ্যাঁচড়া চোরের কম্ম নয়?'

এর মধ্যেই পূর্ণতা জিজ্ঞেস করল, 'দিদি, মূর্তিটা চুরি হলো কখন? মানে আপনারা কখন জানলেন?'

তমাপ্পি হেসে পূর্ণতার পিঠ চাপড়ে বলল, 'গুড কোশ্চেন। একেবারে গোয়েন্দার সাগরেদের মতোই কোশ্চেন!'

'সকাল নয়টা থেকে বেলা এগারোটার সময়ই হবে। কারণ খুব সকালে মা ওই ছোট্ট পুজোর ঘরে ঢুকে পরিষ্কার করে পুজো সারেন। সঙ্গে সবসময় আমাদের বাড়ির ঝি মনিদি থাকে। আটটার পরে পুরুতমশাই সাগরেদকে নিয়ে পুজোর সামগ্রী নিয়ে আসে। পুজোটুজো সেরে নটার সময় বেরিয়ে যান। কারণ তখন বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার সময়। বাবা যাওয়ার কিছুক্ষণ পর পুরুতমশাই সাগরেদকে নিয়ে বেরিয়ে যান। তারপর মনিদি আবার পুজোর ঘরে ঢোকে। কারণ পুরুতমশাইয়ের দেয়া পুজোর অর্ঘ্যের মধ্যে বাতাসাজাতীয় জিনিস থাকায় বেড়াল বড্ড উৎপাত করে। তাছাড়া যেদিন পুরুতমশাই আসেন সেদিন মনিদি পুজোর শেষে খুব ভালো করে ঠাকুরঘরটা ধুয়ে মুছে রাখে। পুরুতমশাই বেরিয়ে যাওয়ার পরেও বালতিভর্তি জল নিয়ে পুজোর ঘর পরিষ্কার করে। তারপর পুজোর ঘরের

দরজা লাগিয়ে দেয়। মনিদি জোর গলায় বলেছে তখনও ও গণেশঠাকুরকে দিব্যি দেখেছে।'

'গণেশঠাকুর যে নেই, তা আবিষ্কার হলো কখন? কে আবিষ্কার করল?'

'এগারোটার পরে। মা পুজোর ঘরে ঢুকে দেখে, গণেশঠাকুর নেই।'

'হু। এর মধ্যে বাড়িতে কে কে এসেছিল? আর কে কে বেরিয়ে গেছে?'

'প্রথমে বেরিয়ে গেছে বাবা। সকাল নয়টায়। তারপর ওই হ্যাংলাপাতলা হাড় জিরজিরে পুরুতঠাকুর আর তার কিশোর চ্যালা।'

'তোর বাবাকে বাদ দিলাম। নিজের জিনিস কে আর চুরি করে! পুরুতঠাকুর আর কিশোর চ্যালার হাতে কিছু ছিল?'

'সবসময় যা থাকে। পুজোর খালি থালি, খালি ডালা আর একটা পিতলের ঘট। ওগুলো খালি ছিল কারণ পুজোর সামগ্রী পুজোর ঘরে দিয়ে গেছে। আর কিছু ছিল বলে চোখে পড়েনি।'

'তারপর?'

'পুরুতঠাকুরের পরে বাজারঠাকুর রমেনখুড়ো। মার কাছ থেকে বাজারের টাকা আর মনিদির কাছ থেকে বাজারের থলি নিয়ে সাড়ে নটার দিকে বেরিয়ে যায়। রমেন খুড়ো আমাদের অনেক পুরোনো কাজের লোক। দাদুর আমলের লোক। ঘাড় কুঁজো রোগাপটকা বুড়ো মানুষ।'

তমাপ্পি জিজ্ঞেস করল, 'এর মধ্যে বাড়িতে আর কেউ এসেছিল?'

'হুঁ। বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সুধাংশুদা। সুধাংশুদাও সাড়ে আটটা নাগাদ আসে। বাবার সঙ্গেই বেরিয়ে যায়।'

'সুধাংশুদা কেমন লোক? বেরিয়ে যাওয়ার সময় তার হাতে কিছু ছিল?'

'সুধাংশুদা বেশ লাজুক ধরনের যুবক। সে পুজোর ঘরের দিকে গিয়েছিল কিনা বলতে পারি না। আমি তখন আমার ঘরে ছিলাম। সুধাংশুদা বাবার সঙ্গেই বেরিয়ে যায়। হ্যাঁ, সুধাংশুদার হাতে একটা ব্যাগ ছিল। মেয়েদের পার্সের সাইজের কালো চামড়ার একটা হ্যান্ডব্যাগ। ওতেই বাবার ব্যবসায়ের হিসাবের কাগজপত্র নিয়ে আসে।'

'এর মধ্যে আর কেউ বাড়ির বাইরে গেছে বা এসেছে?'

'ও হ্যাঁ। এগারোটার দিকে বাবার দোকানের আরেকজন কর্মচারী গোপাল এসেছিল। ও সাধারণত দোকানে ফুটফরমায়েশ খাটে। বাড়ি থেকে বাবার দুপুরের খাবার নিয়ে যায়। মনিদিই ওর টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার গুছিয়ে দিয়েছিল। ও টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই মা আবিষ্কার করে গণেশ মূর্তিটি নেই। আমার পরিষ্কার মনে আছে।'

পূর্ণতার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন খচমচ করছিল। করবে না করবে না করেও জিজ্ঞেস করল, 'শ্রীলাদি, কষ্টিপাথরের গণেশ মূর্তিটি যে বাজারে অনেক দামি জিনিস, তা কে কে জানত? আর মূর্তিটি কেমন দামি?'

'শুনেছি কষ্টিপাথরের অনেক দাম। বাবা মাকে প্রায়ই বলতেন। তাছাড়া এখন বর্তমান বাজার মূল্য নাকি তিন চার লাখ টাকা হবে, এরকমটিই জানি। বাড়ির প্রায় সবাই জানে। পুরুতঠাকুর জানে। বাবার দোকানের কর্মচারীরা জানে কিনা জানি না। হয়তো বাবার মুখে শুনে থাকবে।'

আচমকা তমাপ্পি একটা প্রশ্ন করল, 'তোদের বাড়িতে ময়লার গাড়ি কখন আসে? আর সেই গাড়িতে ময়লা ফেলতে যায় কে?'

'ময়লার গাড়ি দুপুরের পরে আসে। ময়লা ফেলার কোনো নির্দিষ্ট লোক নেই। যখন যে পারে ময়লা নিয়ে যায়। কখনও রমেন কাকু, কখনও মনিদি, রান্নার ঠাকুরও ফেলে, মাঝেমধ্যে তো আমিও ফেলি। কেন?'

'কারণ তোদের গণেশ ঠাকুর কে নিয়েছে তা ধরে ফেলেছি। কিন্তু কোথায় আছে অথবা এতক্ষণে এ বাড়ি থেকে পাচার হয়ে গেছে কিনা তা নিশ্চিত ছিলাম না।'

'এখন নিশ্চিত হয়েছিস?'

'হ্যাঁ। গণেশ ঠাকুর এই বাড়িতেই আছে। আমি বললেই তুই সেই জায়গা সার্চ করে দেখবি। আমার ধারণা এখনও ওটা বাড়ির বাইরে যায়নি। ভাগ্যিস, তুই সময়মতো আমাকে পেয়ে গেছিস। না হলে আরেকটু দেরি হলে ওটা এতক্ষণে তোদের হাতছাড়া হয়ে যেত।'

শ্রীলা বেশ উত্তেজিত স্বরে বলল, 'কী হেঁয়ালি করছিস! গণেশ ঠাকুরটা এখন ঠিক কোথায় আছে বল! কে চুরি করেছিল?'

এখন পাঠক বলুন তো কে গণেশ ঠাকুর চুরি করেছিল? ওটা এখন কোথায় আছে? গোয়েন্দা তমাপ্পি তা কীভাবে বের করল?

ট্রেনে ডাকাতি

গরমের ছুটি। ক্ষুদে গোয়েন্দা অমির স্কুলে প্রায় মাসখানেক ছুটি হয়েছে। অমির স্কুলের ছুটির সঙ্গে মিলিয়ে বাবাও অফিস থেকে দিন সাতেকের ছুটি নিয়েছেন। ইচ্ছে, সপরিবার গ্রামে গিয়ে নিজ বাড়ির গাছপাকা আম, জাম, কাঁঠাল এসব মৌসুমি ফল খাবেন। শহুরে ছেলেকে গ্রামের জলহাওয়ার সঙ্গে একটু নিবিড় সম্পর্ক গড়ে দেবেন।

বাবার ইচ্ছে ছিল বাসে যাওয়ার কিন্তু অমির ইচ্ছেতেই ট্রেনে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো।

রেলগাড়ি খোলা প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হু হু করে ছুটছে। সে জানালার কাছে বসে যমুনা ব্রিজের উপর দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছে– ভাবতেই অমির মনের মধ্যে শিহরণ খেলে গেল।

বিমানবন্দর স্টেশন থেকেই ট্রেনে উঠল ওরা। এখানে ট্রেন খুব বেশি সময় থামে না। কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই উঠতে হলো। ওদের সিট রিজার্ভ কামরায় হওয়ায় তেমন ভিড় নেই। আটজনের জন্য কামরায় বাবা মা অমি তিনজন উঠেছে। কমলাপুর থেকে আরো তিনজন যাত্রী আগেই উঠে বসেছিল। ওরা এক পরিবারের হওয়ায় একপাশে সবগুলো সিট নিয়ে বেশ জাঁকিয়ে বসল। বাবা বললেন, 'এখন একটু চুপ করে বোস। ট্রেন ছেড়ে দিলে তারপর ঘোরাঘুরি করিস।'

ভারী লেন্সের চশমার ফাঁক দিয়ে অমি পাক্কা গোয়েন্দার মতো বসে বসে কামরার লোক তিনজনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক বাবার উল্টো দিকের সিটে বসে আছেন। দেখে মনে হয় বাবার মতো অফিস করেন। হাতে ছোট একটা কালো হ্যান্ডব্যাগ। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে। পরিষ্কার কামানো গাল। চোখে চশমা। ছোট্ট ব্যাগ দেখে মনে হয় হয়তো অফিসের কাজেই কোথাও যাচ্ছেন। ওপাশের কোণের দিকে আসনে বসে আছে এক মাঝবয়সি

যুবক। চেহারার মধ্যে কেমন যেন ঢিলেঢালা ভাব। কাছে কোনো ব্যাগট্যাগ কিছু নেই। এটুকু পথ আসতেই কেমন ঘুমে চোখ ঢুলুঢুলু। পোশাকআশাকও এই শ্রেণির কামরায় ওঠার মতো অভিজাত নয়। একে দেখে অমির কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে। এই লোকটার কোনো একটা মতলব নিশ্চয় আছে। একে চোখে চোখে রাখতে হবে। এর মধ্যে একটা...

অমির ভাবনার তার ছিন্ন হয়ে গেল। সেই অফিসিয়াল ভদ্রলোক অমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম তোমার খোকা?'

'আয়মান কাশফি অমি।'

'কোন ক্লাসে পড়ো?'

'ক্লাস এইটে। জেএসসি পরীক্ষা দেব।' অমির কথা বলতে ভালো লাগছিল না। কথা বলার চেয়ে গোয়েন্দাগিরিতেই তার মনোযোগ বেশি। ভদ্রলোক এবার অমির বাবার সঙ্গে কথায় মেতে যায়। অমি কামরার অন্য যাত্রীর দিকে মনোযোগ দেয়।

এই লোকটাই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। সাধু-সন্ন্যাসী গোছের কেউ হবে। গায়ে গেরুয়া। মুখে ভর্তি দাড়ি। ওর দাড়িটা নকল নয়তো? সাধু সন্ন্যাসীরা ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ায়। ওরা কেন রিজার্ভ সিটে কামরায় বসে যাবে। এ আবার কেমন সাধুবাবা? এই রাতেও চোখে গগলস দিয়ে রেখেছে? সাধুবাবার কি চোখের কোনো অসুখ, নাকি কোনো বদ মতলব আছে?

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। রাতের অন্ধকার চিরে কু ঝিক ঝিক শব্দ তুলে ট্রেন ছুটে চলছে। এখনও ঘুমানোর মতো রাত হয়নি। প্রতিটি আসনের উপর কিছু পড়ার জন্য ছোট্ট আলোর ব্যবস্থা আছে। বাবা আজকের দিনের পত্রিকা বের করেছেন। মা এক কোণে বসে অন্য দিকে মুখ করে আছে। অমিও ওর বিশেষ ব্যাগ থেকে 'তিন গোয়েন্দা'র ভলিউম টেনে বের করে কিশোর পাশা, মুসা, রবিনের সঙ্গে গোয়েন্দাগিরিতে নেমে পড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন একনাগাড়ে চলল। অমিও হাত পা ছোড়াছুড়ি করার জন্য কামরার বাইরে এসে জানালা দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে আলোর ফুটকি দেখতে লাগল। এর মধ্যে একবার চাওয়ালা এসে চা দিয়ে গেছে। অমি চা খায়নি। একটা কোল্ড ড্রিংকস খেয়েছে।

কামরায় ফিরে বইখানা আবার তুলে নিল। কিন্তু এখন আর যেন পড়তে ভাল্লাগছে না। ট্রেনের দুলুনি আর শীত শীত বাতাসে কেমন যেন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। মা তো মুখের উপর কাপড় ঢাকা দিয়ে আরামদায়ক পজিশনে বসে আছেন। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবা এখনও পেপার পড়ছে। সাধুবাব-ার মুখের কালো গগলসের কারণে বোঝা যাচ্ছে না। সেই মাঝবয়সি যুবকটি এখন ঘুমিয়ে কাদা।

সিগন্যাল দিয়ে ট্রেন থেমে গেল। আর থামতেই কামরার যাত্রীদের মধ্যে

অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করল অমি। অফিসার ভদ্রলোক হাতের ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই ঘুম থেকে তড়াক করে উঠে বেরিয়ে গেল সেই মাঝবয়সি যুবকটি। সাধুবাবাও তার আসন ছেড়ে খুব গাম্ভীর্যের সঙ্গে নেমে পড়ল।

বাবা আপন মনেই বললেন, 'এখানে বোধ হয় সবাই কিছু না কিছু কেনাকাটা করে। তোরা বস। আমি একটু বাইরে থেকে দেখে আসি।'

কামরার কেউ এখনো ফিরে আসেনি। তবে একজন মাঝবয়সি লোক গলায় মোটা বকলেস লাগানো একটা কুকুরের রশি ধরে ট্রেনের কামরার ভেতরে ঢুকে আসন মিলিয়ে ভারী গলায় বলল, 'এই কামরাতেই আমার সিট খোকা? কামরার অন্যরা সব কোথায় গেছে?'

'বাইরে।' অমি বলতে বলতে কুকুরটার দিকে তাকাল। কেমন হিংস্র চেহারার কুকুর। দেশি কুকুর নয়। বিলিতি হাউন্ড টাইপের হবে। অমি শার্লক হোমসের বাস্কারভিলের হাউন্ড পড়েছে। তাতে মনে হয় এরকম কুকুরের কথাই আছে। কুকুরটা কি কাদাপানি মাড়িয়ে এসেছে নাকি? ঢুকতেই কামরায় পায়ের ছাপ পড়ল।

তারপর বাবা ঢুকলেন। ঢুকলেন সাধুজি। সেই মাঝবয়সি যুবক এবং অফিসার ভদ্রলোক। আরেকজন যাত্রী বাকি ছিল তিনিও এলেন। এক স্কুলের হেডমাস্টার। হাতে বই।

ট্রেন ছাড়তেই হঠাৎ গোলমালের শব্দ শোনা গেল। সবাই সচকিত হয়ে উঠল।

বাবা সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, 'এখানে চুপচাপ বসে থাক। একটুও মাতব্বরি করবি না।'

অমিদের বেশিক্ষণ বসে থাকতে হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে রেল পুলিশের লোক কামরায় কামরায় হানা দিতে থাকে। অমি এই ফাঁকে বাবা-মার নজর এড়িয়ে বেরিয়ে যায়। খুনটা হয়েছে পাশের কামরাতেই। কামরার ভেতরে লোকের ভিড় ঠেলে একনজর দেখেই অমির গা গুলিয়ে ওঠে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা মেঝে। সেই রক্তের মধ্যে অদ্ভুত ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেখে অমি অবাক হয়। বাবার পিটুনির হাত থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি নিজেদের কামরায় ফিরে আসে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের কাছ থেকেই ঘটনা জানা গেল। অন্য এক কামরায় গোপাল চন্দ্র নামে এক রত্ন ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। ব্যবসায়ী চার সিটের এক কামরা নিজের জন্য রিজার্ভ করেই যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী। স্ত্রী একটু ঘোরাঘুরি করার জন্য কামরা থেকে বেরিয়ে ফিরে এসে দেখেন, মিনিট দশেকের মধ্যে তার স্বামী খুন হয়েছেন। রক্তে কামরা ভেসে যাচ্ছে। গোপাল চন্দ্রের বুকে ছুরি বিদ্ধ হয়ে আছে। স্ত্রীর কাছ থেকেই জানা

গেল, তার স্বামীর কোমরের কাছে একটা ছোট্ট থলে ছিল। সেই থলেতে আনুমানিক পাঁচ লাখ টাকার হীরে ছিল। স্বামীর খুনের পাশাপাশি সেই থলেও লাপাত্তা। ডাকাতি করেই খুনটা করা হয়েছে। স্ত্রী ভেঙে পড়েছেন। পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর প্রতিটি কামরায় তল্লাশি শুরু করেছেন। কারণ ঘটনার বিবরণে এবং স্ত্রীর তথ্যমতে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পরেই খুনটা হয়েছে। কাজেই আসামি কোনো না কোনো কামরাতেই আছে। কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে পারেনি।

ইন্সপেকটর সবার টিকিট চেক করে কে কোথা থেকে উঠেছে দেখে কামরার ভেতরে চিরুনি তল্লাশির হুকুম দিলেন।

পুলিশের লোকজন কামরার প্রতিটি সদস্যের মালপত্তর, ব্যাগ ব্যাগেজ, এমনকি জামাকাপড়ের ভেতরেও চিরুনি তল্লাশি শুরু করল। সাধুজির চোখের চশমা পর্যন্ত খুলতে হলো। হীরেগুলো বেশ ছোট জিনিস হওয়ায় হেডমাস্টারের হাতের বই, তিন গোয়েন্দার ভলিউমের ভেতরেও খুঁজে দেখা হলো। খুঁজে দেখা হলো পানির বোতলের ভেতরেও। কোথাও হীরের চিহ্নমাত্র নেই।

পুলিশের লোকেরা যখন খুঁজে টুজে কারোর কাছে কিছুই পেল না, বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল তখনই একটা কচি কণ্ঠ বোমা ফাটাল।

'আমি জানি খুনি কে?' অমি জোরালো স্বরে বলল।

বাবা অমির মুখ চেপে ধরার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেকটর গর্জে উঠলেন, 'ওকে বলতে দিন।'

'আমি জানি খুনি কে। খুনি এই কামরার মধ্যেই আছে। আর সেই হীরেগুলো খুনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তাও জানি। আপনারা তল্লাশি করলেই বের করতে পারবেন।'

ইন্সপেকটর হতভম্বের মতো বললেন, 'কিন্তু আমরা তো তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি খোকা। কোথাও তো পাইনি। তুমি আমাদের দেখিয়ে দাও।'

অমি দেখিয়ে দিল। খুনি বমাল ধরা পড়ে গেল। ইন্সপেকটরের হতভম্ব ভাব তখনও কাটেনি। তিনি অমির মাথা হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'যে জিনিসটা আমাদের চোখে পড়েনি, সেটা তুমি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে খোকা। তুমি কীভাবে ব্যাপারটা ধরতে পারলে?'

অমি ওর গোয়েন্দাগিরি খুলে বলল।

এখন পাঠক বলুন তো, অমি কীভাবে খুনিকে শনাক্ত করল? কী দেখে বুঝতে পারল? আর হীরেগুলো কোথায় লুকানো ছিল?'

হীরের আংটি

বহুতল বাড়িতে নিজেদের ফ্ল্যাটে উঠে আসার পরে কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগে রায়হানের। বাবা-মাকে পুরোনো ধাঁচের বাড়িতে ফেলে রেখে এসে নিজেরা এরকম অভিজাত ফ্ল্যাটে থাকতে গিয়ে একধরনের অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়। কিন্তু নিজের সন্তান ইরার ভবিষ্যৎ আর স্ত্রী মীরার জোর জবরদস্তিতে নিজের জমানো সব টাকা এবং ব্যাংক লোন নিয়ে এই ফ্ল্যাট কিনেছে।

ফ্ল্যাটে এসেই মীরার কাছে যে জিনিসটা অস্বস্তিকর মনে হয়েছে তা কাজের বুয়াদের জটলা। অনেকদিন ইরাকে নিয়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে মীরা লক্ষ্য করেছে ওপরে ওঠার সিঁড়ির সঙ্গে চওড়া জায়গাটায় বসে জটলা করছে নানা ফ্ল্যাটের বুয়ারা। কেন বা কী জন্য তা ঠিক জানে না কিন্তু ওদের এই জটলা দেখলেই ইরার মনে হয় ওদের আড্ডার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ফ্ল্যাটের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নানা মুখরোচক গল্প। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে ইরার মনে হয় এই ঝি-চাকর বুয়ারা মিলে ফ্ল্যাটের কারো না কারো সর্বনাশের জাল বুনছে। আর যেহেতু তারাও ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, তাই এর মধ্য থেকে তারা কোনোমতে বাদ যায় না।

ফ্ল্যাটে আসার পরপরই বাড়ি থেকে কাজের লোক হিসেবে ষোড়শী সালমাকে নিয়ে এসেছিল মীরা। কিন্তু বিবাহযোগ্য মেয়েকে ফ্ল্যাটবাড়িতে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে ওর বাবামা ওকে বিয়ে দিতে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে আর নির্দিষ্ট কোনো কাজের লোক এখনও জোগাড় করতে পারেনি মীরা। ঠিকে ঝি নাজমার মা এসে ধোয়ামোছা কাপড় কাচার কাজ করে দিয়ে চলে যায়। ঘণ্টাখানেক কাজ করে। একটু বেশি সময় করলেও সময়ের অজুহাত দেখায়। উপরি কিছু না দিলে বেশি সময়ক্ষেপণ করতে চায় না। অথচ বাকি সময়টা সে ফ্ল্যাটের অন্য বুয়াদের সঙ্গে গালগল্প করে কাটায়। তখন আর তার সময়ের অপচয় হয় না।

মীরাদের মুখোমুখি ফ্ল্যাটে থাকে নিঝুমরা। নিঝুমের ব্যবসায়ী বাবা বেশিরভাগ সময় ব্যবসার কাজে বাইরে বাইরে থাকে। নিঝুমের মায়ের সঙ্গে স্থায়ী ঝি রহিমা থাকে। স্বামী পরিত্যক্তা রহিমার স্বভাবই হলো অন্য ফ্ল্যাটে কোথায় কী হচ্ছে তা সবাইকে জানানো। ঝি-চাকরদের কাছে সে বিবিসি নামে পরিচিত। তিনতলার বাড়িওয়ালার বাসায় যে থাকে তাকে ঠিক ঝি বা বুয়ার কাতারে ফেলা যায় না। বাড়িওয়ালার কেমন জানি দুরসম্পর্কের আত্মীয়। কানে হেয়ারিং এইড লাগানো রন্টুর মা বাড়িওয়ালার সংসার সামলানোর পাশাপাশি নিজ সন্তান রন্টুকে পড়াশোনা শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যস্ত।

চারতলায় ডান পাশের ফ্ল্যাটের সুমনারা পুরোনো বাসিন্দা। সুমনা মাস্টার্স শেষ করে ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকতেই তার বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। পাত্র ইয়াসিন সুমনার আগের থেকেই পছন্দ করা। ইয়াসিন কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার। গত কদিনে এই ফ্ল্যাটের বুয়াদের আলোচনার মূল কথাই সুমনার বিয়ে। সুমনাদের বুয়া শিলার কাছ থেকে অন্য বুয়ারা বিয়ের গল্প শোনে। পাত্রপক্ষ কতটা খরচ করছে, কোথায় কোথায় কৃপণতা দেখাচ্ছে, মেয়ের বিয়েতে এদের কে কে আসবে কে কে আসবে না এসব খবর অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের আগে ঝি-চাকরদের কানে পৌঁছে গেছে। এমনকি বিয়েবাড়ির সব আপডেটই শিলার মাধ্যমে ফ্ল্যাটের অন্য ঝি-চাকর ড্রাইভাররা জেনে গেছে।

সুমনার বিয়ের অনুষ্ঠান কমিউনিটি সেন্টারে করলেও গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানটা এই ফ্ল্যাটেই হবে বলে ঠিক করেছে সুমনার বাবা। বাড়িওয়ালার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ছাদে শামিয়ানা টাঙিয়ে ছাদটাকেই অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল বানিয়েছে। আর পারিবারিক এই অনুষ্ঠানে ফ্ল্যাটের কোনো সদস্যই শুধু নয়, কোনো ঝি-চাকরও বাদ পড়েনি।

আর বিয়ের অনুষ্ঠানেই অঘটনটা ঘটল। চুরি হয়ে গেল কনের হীরের আংটির বহুমূল্যবান হীরে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কেউ আংটি থেকে খুঁচিয়ে হীরে তুলে নিয়েছে। এবং নিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। কারণ গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সময়ই কনের হাতে হীরের আংটি ছিল। শেষ মুহূর্তে শরীর খারাপ লাগায় ফ্রেশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ায় বুয়াদের সঙ্গেই ফ্রেশরুমে গিয়েছিল সুমনা। ফিরে এসে দেখে তার হাতে আংটি আছে ঠিকই, কিন্তু আংটির হীরে নেই।

মুহূর্তেই টনক নড়ল সবার। গায়ে হলুদে আমন্ত্রিত সবাইকে অনুরোধ করা হলো নিজ নিজ অবস্থানে থেকে চুরির সুরাহার সহযোগিতা করতে। এসব ছোটখাটো চুরি পুলিশকে না জানানোই বেটার। রায়হানের পরিচিত শখের গোয়েন্দা রাশেদকে তলব করা হলো।

আধাঘণ্টার মধ্যে এসে গেল রাশেদ। ততক্ষণ সবাই চুপচাপ বসেছিল। গায়ে হলুদের হুল্লোড়ে নেমে এসেছিল নীরবতা।
রাশেদ এসেই সবাইকে বলল, 'হীরের আংটির হীরেটা ছোট। তা লুকানোর এত বেশি জায়গা আছে যে খোঁজাখুঁজি করে খুঁজে বের করা যাবে না। কাজেই আপনারা আমাকে সহযোগিতা করলে আমি হয়তো প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে চোরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি।'
বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে ভদ্রজনেরা সবাই সহযোগিতা করবে বলে সম্মতি দিল। এই অবস্থায় কনেকে কিছু জিজ্ঞেস করা অশোভনীয় হলেও রাশেদ না জিজ্ঞেস করে পারল না।
'সর্বশেষ কখন আপনি আংটিটি আপনার হাতে খেয়াল করেছিলেন? মানে আংটির ওপর হীরেটা?
'আমি ফ্রেশরুমে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হাতের আংটি হাতেই ছিল। ফ্রেশরুমে যাব বলেই বান্ধবী কেউ আসেনি। কিন্তু বিয়ের কনেকে একা ছাড়তে নেই বলে আমাদের ফ্ল্যাটগুলোর বুয়ারাই আমার সঙ্গে ছিল। হাত ধোয়ার সময় আংটিটা বেসিনের উপর খুলে রেখেছিলাম। তারপর আবার হাতে পরে নিই।
'তখন আংটির উপর হীরে বসানো আছে কিনা দেখেছিলেন?'
'অতটা খেয়াল করিনি।
'কখন খেয়াল হয়?
'ফ্রেশরুম থেকে বেরিয়ে এসে গায়ে হলুদের স্টেজে বসতেই বান্ধবী রীমাই প্রথম দেখতে পায়।
'হু। তার মানে এটা বুয়াদের কাজ। ফ্রেশরুমে কোন কোন বুয়া আপনার সঙ্গে ছিল?
'আমাদের বুয়া ছিল। ছিল দোতলার ঠিকে বুয়া নাজমার মা। তার পাশের ফ্ল্যাটের নিঝুমদের বুয়া রহিমা। ছিল বাড়িওয়ালার বুয়া আন্টি রন্টুর মা।
রাশেদ সুমনাকে ছেড়ে দিয়ে বুয়াদের ডাকল। বুয়ারা সবাই ভয়ে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাশেদ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'সত্যি কথা বললে কোনো ভয় নেই। আংটির ব্যাপারে কে কী জানেন বলেন?'
কেউ মুখ খুলল না। অগত্যা রাশেদ একজন একজন করে জেরা করার সিদ্ধান্ত নিল।
জেরায় শিলা জানাল, 'আফার হাতে আংটি আমি দেখিছিলাম। আফায় আংটি খুলে রাখলি আমি রন্টুর মার কানে কানে ফিসফিস করে কইলাম, দেখছাও বু আফার কান্ড। হাত ধুতি এসে আংটি খুলি রাখিছে। রন্টুর মা বু শুনি কইলো, 'আফার কান্ডজ্ঞান ওইরকম। যদি হারায় যায়!'
রহিমা বুয়া বলল, 'আমি আংটি দেখিনি। আফার শরীরটা একটু খারাপ

লাগছিল বলে চোখেমুখে পানি দিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন দেখি ওরা দুইজন কি যেন কানাকানি করছে।'

রাশেদ এবার রায়হানদের ঠিকা বুয়া নাজমার মাকে জিজ্ঞেস করল। নাজমার মা উত্তর দিল, 'স্যার, আমিও আংটি দেখি নাই। আফার কাছেও ছিলাম না। ফ্ল্যাটে থাকি না বলে ওদের থেকে একটু দূরে দূরেই থাকি। আমি ফ্রেশরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। ওরা তিনজনে আফারে নিয়ে নিচু হয়ে কী করছিলি কিছুই দেখিনি।'

রাশেদ এবার রন্টুর মা বুয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'আংটি আর আংটি থেকে খুলে নেয়া হীরের ব্যাপারে আপনি কী জানেন?'

রন্টুর মা কোনো কথা বলল না, যেন শুনতেই পায়নি। পাশ থেকে বাড়িওয়ালা বলল, 'রন্টুর মা ঠিকমতো কানে শোনে না। হেয়ারিং এইড না থাকলে ও শুনতে পায় না।'

রাশেদ লক্ষ্য করল, 'রন্টুর মায়ের কানে হেয়ারিং এইড আছে। তারপরও শুনতে পাচ্ছে না। মেশিন নষ্ট নাকি?'

রাশেদের অনুরোধে রন্টুই মায়ের কান থেকে হেয়ারিং এইড খুলে দিল। রাশেদ হাতে নিয়ে কানে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল হেয়ারিং এইড ঠিক আছে।

ঘুরে দাঁড়াল রাশেদ। জানাল চোর ধরা পড়েছে। একটু সার্চ করতেই রাশেদের কথামতো চোরের কাছ থেকে আংটির হীরে বেরিয়ে এলো।

পাঠক বলুন তো চোর কে? আংটির হীরে কোথায় রাখা ছিল? আর রাশেদ কীভাবে তা বুঝতে পারল?

হেকিম মুনশি ও খুনি

প্রকৃতিতে সবে শীতের আমেজ শুরু হয়েছে। চারিদিকে স্কুল পড়ুয়াদের বার্ষিক পরীক্ষার তোড়জোড়। পড়তে পড়তে ক্লান্ত শিক্ষার্থীরা একটু হাফ ছেড়ে বাঁচতে চায়। একটানা কতক্ষণই বা পড়া যায়! পরীক্ষার রুটিন দিয়েছে। স্কুল ছুটি। কিন্তু ঘরে বসে একঘেয়ে সুরে পড়তে পড়তে হাঁপিয়ে ওঠা মন একটু ঘুরে আসতে চায়। তাই তো ওরা পড়ার ক্লান্তি ভুলে মুনশি দাদুর ঘরের বাইরে জটলা পাকায়।

হেকিম মুনশি দুপুরের ভাতঘুম দিয়ে উঠে ঘরের বাইরে বেরুতেই ক্ষুদে পড়ুয়াদের দেখতে পেলেন। তিনি ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভারী ভ্রু কুঁচকে বললেন, 'কিরে, তোরা সব আমার ঘরের পাশে ঘুর ঘুর করছিস কেন? আমার ঘরে কি তোদের কোনো ক্লাসের বই আটকা পড়েছে নাকি?'

ফজু একটু আঁতেল টাইপের। সে বিষণ্ন সুরে বলল, 'বই আটকা পড়েনি দাদু। মন আটকা পড়েছে।'

ফজুর কথায় মুনশি দাদু হেসে ফেললেন। ষড়যন্ত্রের সুরে বললেন, 'সেই আটকা পড়া মন বের করতে হলে মুনশি দাদুর গল্প শোনা চাই, তাই তো?'

ডিটু একটু ফিচেল হাসি দিয়ে বলল, 'গল্প নয় দাদু! তোমার জীবনের সত্য ঘটনা।'

হেকিম মুনশি ডিটুর কথার ধরনেই বুঝতে পারলেন ওরা তার বলা জীবনের গল্পগুলোকে খুব একটা বাস্তব গল্প বলে মনে করে না। হেকিম মুনশি বললেন, 'তোদের আমি আমার জীবনের গল্প বলতে পারি। কিন্তু গল্প শোনা শেষ হলে পড়ে দিতে হবে। না হলে কিন্তু আমি তোদের মায়েদের বকা থেকে রক্ষা করতে পারব না।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, দাদু। পড়ে দেব। এমনিতেই তো আমরা সবসময় পড়ি।'

আমার কথা শুনে দাদু এবার আমার দিকে ফিরলেন। তারপর ষড়যন্ত্রের

সুরে চাপা গলায় বললেন, 'তাহলে যা তো চট করে তোর মায়ের ঘর থেকে পানের বাটাটা নিয়ে আয় তো! পান না মুখে দিলে আমার গল্প আসে না।'
আমি দাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'আমি না আসা পর্যন্ত কিন্তু গল্প শুরু করবে না!'
মাকু ফোড়ন কাটল, 'গল্প নয় সত্যি!'
আমি পান নিয়ে এসে দেখি মুনশি দাদু আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে গল্পের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমার হাত থেকে পান নিয়ে মুখে পুরে চিবাতে চিবাতে শুরু করলেন, 'তখন আমার ভবঘুরে জীবন। পানা শেওলার মতো এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এমন জীবিকা নেই যা করিনি। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করেছি। কিন্তু কোনো কিছুতেই মন বসে না...'
জলু একটু উস্মার সঙ্গে বলল, 'দাদু, আপনার এই বয়ান অনেকবার শুনেছি। মূল গল্প শুরু করেন।'
মুনশি দাদু রাগ করলেন না। হেসে বললেন, 'গল্পের আগে শানে নযুল না বললে ব্যাপারটা তো বুঝতেই পারবি না। যা হোক, মূল গল্পেই আসি। জীবিকার প্রয়োজনে তখন এক রেস্তোরাঁয় ভিড়ে গেছি। বেয়ারার কাজ করতাম। রেস্তোরাঁর মালিক আহমেদ মুস্তাফা বেশ ধুরন্ধর টাইপের লোক। রেস্তোরাঁর বিক্রিবাট্টা বাড়াতে রেস্তোরাঁ ব্যবসার পাশাপাশি নানারকম ধান্দায় ব্যস্ত থাকে। বেশ তুখোড় লোকই বলা চলে। রেস্তোরাঁয় কুক, ডিশ ওয়াশার, বেয়ারা, বয় মিলে বেশ কয়েকজন কর্মচারী। সবার সঙ্গে যে সবার খুব একটা সদ্ভাব তা বলা যায় না। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠানে থাকলে যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে তা সবার মধ্যে ছিল। তাছাড়া ওরকম কাঠখোট্টা কৃপণ মালিকের বিরুদ্ধে সবারই এক ধরনের ক্ষোভ ছিল। আর সেই ক্ষোভের কারণে মালিকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যাপারে সবার একাট্টা হতে সময় লাগত না।
'আগেই বলেছি রেস্তোরাঁর মালিক আহমেদ মুস্তাফা রেস্তোরাঁর খদ্দের বাড়ানোর জন্য নানারকম ব্যবস্থা করত। কখনো গান বাজনা, কখনো নাচ, কখনো ম্যাজিক, কখনো নিশানা লাগানোর খেলা এসব। কিন্তু তারপরেও আহমেদ মুস্তাফা খুশি হতে পারছিল না। ওর ধারণা হয়েছিল, এসব করে রেস্তোরাঁর বিক্রিবাট্টা খুব বেশি বাড়ছে না। তখনই মালিকের মাথায় নাটকের বুদ্ধিটা আসে। রেস্তোরাঁয় নৈশকালীন আয়োজনে মঞ্চনাটকের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু অত্যধিক কৃপণতার কারণে নাটকের গোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর মতো পয়সা ব্যয় করার কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। তাই আমাদের বয়, বেয়ারা, কুকের মধ্য থেকে সে কয়েকজনকে মঞ্চনাটকে অভিনয়ের কাজে নামার তাগিদ দিল। আমরাও দেখলাম, একঘেয়ে কাজের

ফাঁকে একটু অন্যরকম বিনোদন হবে, একঘেয়েমি কাটবে। তাছাড়া আমাদের মধ্য থেকে যারা প্রতিদিন অভিনয় করবে, তাদের আলাদা পারিশ্রমিক দেয়া হবে। সব মিলিয়ে আমরা মোট ছয়জন রাজি হয়ে গেলাম। তার মধ্যে আহমেদ মুস্তাফা নিজেও একজন। ওর রুক্ষ, তামাটে, ক্রুর চেহারার কারণে ওকে সবসময়ই ভিলেনের পার্টটাই নিতে হচ্ছিল।

'প্রথম দিকে আমরা পানসে টাইপের পারিবারিক নাটক, প্রেম, সামাজিক সমস্যা এসব নিয়ে নাটক করতে লাগল। কিন্তু এসব প্যানপ্যানানি দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারছিল না। তখনই কার জানি পরামর্শে মালিক ভয়ানক হিংসাত্মক সব নাটকের আয়োজন শুরু করল। স্টেজের উপরে ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার-স্যাপার। কেউ কারুর বুক লক্ষ্য করে রিভলব-ার থেকে গুলি ছুড়ছে। কেউ বন্দুক বাগিয়ে ভয় দেখাচ্ছে। কেউ লম্বা ছুরি ঢুকিয়ে দিচ্ছে কারোর পেটের ভেতরে। আর দুজনের ঘুষোঘুষির অভিনয় তো ঘটছে হরহামেশাই। মাঝেমধ্যে নারী কণ্ঠের কানফাটা আর্তচিৎকার পরিবেশটাকে আরো জমজমাট করে তুলছে। সব কিছুই অভিনয় হলেও এই হই-হট্টগোলই যেন দর্শক বেশ উপভোগ করছে। রেস্তোরাঁয় খদ্দেরও বেড়ে গেছে হু হু করে।

'তখন আরো ভয়ঙ্কর জমজমাটি কীভাবে করা যায় তাই ভেবে আহমেদ মুস্তাফা নতুন নাটক নামালেন। এবারে বীভৎসতা সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাবে। আর ভিলেন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার এই সুযোগও মালিক ছাড়তে চায় না। সুন্দরী নাসরিন এই নাটকের নায়িকা, সে এই হোটেলের নাচনেওয়ালি। আর আছে কুক মিজান, রান্নার পাশাপাশি তার গানের গলা ভালো। সে থাকবে পার্শ্ব চরিত্রে। নায়ক চরিত্রে আছে সুদর্শন বেয়ারা হাফিজ, সে এর আগে এই হোটেলে নিশানা লাগানোর খেলা দেখাত, ম্যাজিকে হাতসাফাইয়ের দক্ষতা আছে। ডিশ ওয়াশার মোমিনের চরিত্র ভাড়াটে খুনির, কুস্তিগীরের মতো ফিগারের কারণে তাকে ওই চরিত্রেই ভালো মানাবে। আমার চরিত্রটা একটু অন্যরকম। আমি একজন কিলার। আসলে এই 'খুন' নাটকে প্রায় সব চরিত্রই কিলার। সুন্দরী নাসরিনকে ঘিরেই নাটকের কাহিনি আবর্তিত। নাসরিনের সৎবাবা আহমেদ মুস্তাফাই হলো ভিলেন। নাটকে নাসরিনকে কাছে পেতে সবাই মিলে পরিকল্পনা করে রাতের আঁধারে আহমেদ মুস্তাফাকে খুন করবে। আর সেই কাজেই সবাই একজোট হয়ে খুন করতে যায় আহমেদ মুস্তাফাকে। কিলার আমার হাতে দোনালা বন্দুক। বেয়ারা হাফিজের হাতে ছোট্ট ছয় ইঞ্চির পিস্তল। কুক মিজানের কাছে ৩২ বোরের রিভলবার। ভাড়াটে খুনি মোমিনের কাছে দেয়া হয়েছে শটগান। নাটক শুরু হতেই পর্দা অন্ধকার হয়ে যায়। আমরা সব খুনি মিলে ভিলেন আহমেদ মুস্তাফার বাসায় যাই। নাটকের সেটেই বাসার

মতো করা হয়েছে। বাসায় আমাদের ঢোকার শব্দ শুনেই আহমেদ মুস্তাফা জেগে ওঠে। অন্ধকারের মধ্যেই সব খুনিই আহমেদ মুস্তাফাকে লক্ষ্য করে একসঙ্গে গুলি ছোড়া শুরু করে। খুনি নাটকের মজাটাই এখানে। সবাইর গুলি করা শেষ হলে আলো জ্বলে উঠবে। দেখা যাবে অন্ধকারে একটা গুলিও আহমেদ মুস্তাফার গায়ে লাগেনি। সবাই গুলি করা শুরু করতেই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক থেকে নানা ধরনের গুলির ঠা ঠা ঠা আওয়াজ শোনা যেতে থাকে। আর সেই আওয়াজের মধ্যেই তীক্ষ্ণ সুরে শিস দেবার মতো একটা শব্দ যেন হঠাৎ শোনা যায়। শব্দটা নাটকেরই অংশ মনে করে কেউ পাত্তা দেয় না। দর্শকরা আরো মজা পেতে থাকে। অন্ধকারের মধ্যেই আহমেদ মুস্তাফা একটা আর্তচিৎকার দিয়ে ঢলে পড়ে। দর্শকরা এরকম ন্যাচারাল অ্যাকটিং দেখে মুগ্ধ হয়। শুধু আমার মনে হতে থাকে কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে। এখানে মোটেই ভিলেনের ওভাবে চিৎপাত হয়ে পড়ে যাওয়ার কথা নয়। তখনই আলো জ্বলে ওঠে। আমরা সবাই দেখতে পাই আহমেদ মুস্তাফার কপাল বেয়ে ঝর ঝর করে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বেচারা লাশের মতোই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নাটকের সেটের মেঝের উপর।

'দর্শকের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি অবস্থা বুঝতে পেরে স্বভূমিকায় নেমে পড়লেন। আমাদের হাতের সবার নকল অস্ত্রসহ আটক করা হলো। দেখা গেল আহমেদ মুস্তাফাকে যে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তা আমাদের কারোর হাতে নেই। শুধু তাই নয়, আহমেদ মুস্তাফার কপালের ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে ছোট্ট একটা বুলেট আবিষ্কৃত হওয়ায় বোঝা গেল তা কোন অস্ত্র থেকে এই ধরনের গুলি বের হতে পারে। আর সেই ব্যাপারে আমি পুলিশকে বলতেই তদন্ত করতে বেরিয়ে গেল কে হত্যাকারী।'

এখন তোরা বল তো কে হত্যাকারী? আর আমি তা কীভাবে বুঝতে পারলাম।

হেকিম মুনশির রহস্যভেদ

মুনশি দাদু একতলার ছাদে মাদুর পেতে গা এলিয়ে বসেছে। চৈত্রের দাবদাহ দিনের বেলায় তপ্ত রেখে রাতেও যেন তার হলকা দিচ্ছে। এক পশলা বৃষ্টির জন্য সবাই হাহাকার করছে। এর মধ্যে শুরু হয়েছে লোডশেডিং। ভ্যাপসা গরমে ঘরের মধ্যে টেকা দায়। ইজিচেয়ারটা ছাদে ওঠানো সহজ হলে ওটাই নিয়ে আসত। কিন্তু মাদুরেও বেশ কাজ হয়ে যাচ্ছে।

লোডশেডিংয়ের কারণে কারোর তেমন পড়াশোনার চাপ নেই। রাতের খাওয়া শেষ করে একে একে ওরা ছাদে চলে এলো। সঙ্গে আরেকটা মাদুর নিয়ে এসেছে। মুনশি দাদুর উপস্থিতি প্রবলভাবে থাকলেও ওরা নিজেদের মধ্যে আলাপেই মত্ত।

জলু বলল, ‘জানিস ডিটু, নতুন যে বাদশাহি আংটি মুভিটা হয়েছে না, অসাধারণ। ছোটচাচার ল্যাপটপে দেখেছি আমি।’

‘আমি ওই গোয়েন্দা কাহিনির বইটা পড়েছি।’ বলল ফজু।

‘বই আর সিনেমার মধ্যে পার্থক্য আছে। বইতে নিজের মতো কল্পনা করে নেয়া যায়। আর সিনেমায় কল্পনাটাকেই জোর করে দেখিয়ে দেয়।’ বলল বিশিষ্ট আঁতেল মাকু।

দাদু তালপাতার হাতপাখাটা ফজুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘একটু বাতাস কর তো। একদম বাতাস নেই। গাছের পাতাও নড়ছে না। কেমন দম ধরে আছে। বৃষ্টি হবে বোধ হয়।’

ফজু বাতাস করতে করতে বলল, ‘বাদশাহি আংটি বইটা তোর কাছে আছে মাকু?’

মাকু উত্তর দেয়ার আগেই দাদু বললেন, ‘কিসের গোয়েন্দা কাহিনি নিয়ে আলাপ করছিস তোরা? বইয়ের? বাস্তবের গোয়েন্দা দেখেছিস কখনও?’

অন্ধকারের মধ্যেও চারজনেই একসঙ্গে দুদিকে মাথা নাড়ল।

'তাহলে এই আমাকে দেখে নে। জীবিকার তাগিদে একসময় আমাকে গোয়েন্দাগিরিও করতে হয়েছে। তবে সেটা শখের গোয়েন্দাই বলতে পারিস। প্রয়োজনের খাতিরেই গোয়েন্দা সাজতে হয়েছে আমাকে।'

ওরা সবাই চিরকুমার পরিব্রাজক মুনশি দাদুর ব্যাপারটা জানে। দাদু সারাজীবন এদেশ ওদেশ এজায়গা ও জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছেন। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ হেন কোনো কাজ নাই যা দাদু করেননি, কাজেই গোয়েন্দা সাজা দাদুর পক্ষেই সম্ভব!

জলু বলল, 'তোমার সেই গোয়েন্দাগিরির গল্পটা আমাদেরকে বলো না দাদু!'

'গল্প নয় রে, সত্যি ঘটনা। সে বেশ আগেরই কথা। তখন তোদের কারোরই জন্ম হয়নি। আমারই তখন কতই বা বয়স, বাইশ-তেইশ হবে! পরিপূর্ণ যুবক। সেই সময়ে জমিদারি প্রথা বিলুপ্তির পথে। পথে বলতে কি, বিলুপ্তই। কিন্তু যারা জমিদার ছিল তাদের জমিদারি চালচলন তখনও বহাল আছে। সেই সময়ে আমি পলাশপুরের একটা মেসে আরো কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে থাকি। তো একদিন এক বন্ধু এসে খবর দিল– পলাশপুরের জমিদারের একমাত্র পুত্ররত্নটির জন্য ওরা একজন লজিং টিউটর খুঁজছে। টিউটর মানে খেলার সাথিই বলতে পারিস। পড়াশোনার পাশাপাশি ওর সঙ্গে ছেলেটার সঙ্গ দিতে হবে।

গিয়ে একটা ছোটখাটো ইন্টারভিউ দিলাম। দেখলাম ব্যবস্থা ভালোই। থাকা খাওয়া ফ্রি, সেই সঙ্গে মাস মাইনে পাওয়া যাবে। রাজি হয়ে গেলাম।

'প্রথমে ভেবেছিলাম ছোকরা খুব বিচ্ছু টাইপের হবে, তাই শায়েস্তা করার জন্য আমার মতন জাঁদরেল মাস্টারমশাইয়ের আমদানির দরকার পড়েছে। কিন্তু গিয়ে সে ভুল ভাঙল। রতন বেশ শান্তশিষ্ট ছেলে, ঠিক পড়ুয়া বলা যাবে না, তবে সব বিষয়েই আগ্রহ। জমিদারি প্রথা না থাকলেও চালচলন বজায় থাকার কারণে ওইটুকু বয়সে রতনকে যেমন ঘোড়ায় চড়া শিখতে হয়েছে তেমনি শিখেছে কুংফু কারাতে জুজুৎ সুর প্যাঁচ। আমি ওর মাস্টারমশাইয়ের চেয়ে সঙ্গী হলাম বেশি।

'জমিদারমশাই নানারকম নেশায় ডুবে থাকতেন। তার মধ্যে তাস পাশা, দাবা খেলা, সুরাপান, গানবাজনা এসব চলত। আর এ কারণেই বাড়িতে লোকজনের চলাচল অবাধ ছিল। গেটে একজন বয়সি প্রহরী থাকলেও সে সবসময় আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকত।'

'এভাবে দিনকাল ভালোই চলছিল। নায়েব গোমস্তা মালি রাঁধুনি সবার সঙ্গেই আমার মোটামুটি একটা ভাব হয়ে গেছে। তাছাড়া রতনের সঙ্গে সময়টা বেশ ভালোই কাটে। কিন্তু একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে জানা গেল, রতনকে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না মানে কাল রাতে খেয়ে-

দেয়ে বই পড়তে পড়তে নিজ বিছানায় ঘুমিয়েছিল। ভোরবেলা চাকর মধু ওকে ঘুম থেকে ওঠাতে গিয়ে দেখল বিছানায় নেই। আগেই বলে নিই রতনের মা দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে গত হয়েছেন। তারপর সবাই সারা জমিদারবাড়ি, আগান-বাগান, সব জায়গা খুঁজে দেখেছে। কোথাও নেই। ঘরের দরজা খোলা পাওয়া গেছে। আমার ঘরটা রতনের ঘরের পাশেই। কাজেই সবাই আমার কাছেই বারবার জানতে চাইল আমি রতনের অন্তর্ধানের ব্যাপারে কিছু জানি না। শুনেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তখনই ঠিক করলাম গোয়েন্দাগিরি করে রতনের অন্তর্ধান রহস্য এবং ও কোথায় আছে খুঁজে বের করব।'

জলু জিজ্ঞেস করল, 'অপহরণকারীরা নিয়ে যায়নি তো?'

'সেটাই তো আমাকে বের করতে হবে। তার আগে গোটা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে লাগলাম। জমিদারবাড়িতে লোকজনের আনাগোনা বেশি হওয়ায় কেউ রাতে ঘাপটি মেরে থেকে রতনের ঘরের ভেতরে লুকিয়েছিল কিনা তারপর মুক্তিপণ আদায়ের জন্য তুলে নিয়ে গেছে কিনা, সেটাই দেখা দরকার। গোয়েন্দারা ঠিক যেভাবে অফিসিয়ালি জেরা করে আমি ওভাবে এগুলাম না। তোদের আগেই বলেছি, এ ক'মাসে বাড়ির মালি দারোয়ান রাঁধুনি সবার সঙ্গেই বেশ ভালো ভাব হয়ে গেছে। তাই এমনি কথাবার্তা বলার ভঙ্গিতে জেরা শুরু করলাম। তার আগে অবশ্য রতনের ঘরটা ভালো করে দেখে নিয়েছি। মানে গোয়েন্দারা যেরকমভাবে দেখে সেরকম আর কি। বইখাতা জামাকাপড় ওর নিত্যব্যবহার্য জিনিস ছাড়া অদ্ভুত কয়েকটা জিনিসও চোখে পড়েছে। যেমন কালো কাপড়ের বেল্ট, আধা জ্বলা মোমবাতি, দাবার ঘোড়া আর মেঝেতে ধস্তাধস্তির ছাপ।'

'তারপরেই জেরা শুরু করলাম আমি। তোদের সংক্ষেপেই বলছি, আফিমখোর দারোয়ানের কাছ থেকে যে তথ্য পেলাম তা হলো সারাদিনে অনেক লোকই এ বাড়িতে যাতায়াত করেছে, তার মধ্যে ওর চোখে পড়েছে, জমিদারের দাবা খেলার সাথি সুধাংশু শেখর দত্ত, দুপুরের পরপরই এসেছিলেন। সন্ধে ঘোর হলেই অন্যদিনের মতো চলে যান। কারণ জমিদার তখন অন্য সঙ্গীকে নিয়ে ব্যস্ত। অর্থাৎ তখন তার প্রিয় সঙ্গী আরেক সাবেক জমিদার বন্ধু নন্দদুলাল রায়ের সঙ্গে নিজ ঘরে পান করছেন। সুধাংশু শেখরের আবার ওসব চলে না। গোটা দুপুর জুড়ে বাগানে রতন ঘোড়দৌড়বিদ জালাল খাঁ-র কাছে ঘোড়া দাবড়ানো শিখেছে। তারপর আস্তাবলে ঘোড়া বেঁধে রেখে নিজের কাজে চলে গেছে। বিকেলে রতনের কুংফু ক্যারাটে জুজুৎসু শেখার টাইম। সেই সময়ে ওর নিয়মিত জুজুৎসুর মাস্টার মিস্টার ওয়াংচু এসেছিলেন। সন্ধেবাতি দেয়ার আগ পর্যন্ত ওয়াংচু তাকে জুজুৎসুর নানা প্যাঁচ শিখিয়েছে। ওয়াংচু এখানে রাতে খানাপিনা

করেই তারপর যায়। হালকা বৃষ্টি হওয়ার কারণে তাকে বৃষ্টি থামার জন্য রাত অবধি দেখা গেছে। জমিদারের গোমস্তা নায়েব ওরা বাড়িতেই ছিল, বাড়িতেই আছে। ওদের কাছ থেকে তেমন কোনো তথ্য বের করা গেল না। তবে নায়েব বলল, জমিদারের সঙ্গে নাকি পাশের গাঁয়ের জমিদার গজানন গাইনের বেশ কিছুদিন যাবৎ জমাজমি নিয়ে একটা মনোমালিন্য চলছিল। সেইটারই মীমাংসা করতে গজানন কাল রাতে জমিদার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। জমিদার তখন পানে ব্যস্ত। তাই গজাননের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে পারেননি। তবে সাধারণ সৌজন্য দেখিয়ে গজাননকে পানের আহ্বান জানান। গজাননও অনেক রাত অবধি জমিদারের সঙ্গে পান করেন। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে যান। কিন্তু এদের কারোর সঙ্গে রতনকে যেতে দেখা যায়নি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, তখন রতন আমার কাছে ওর রুমে পড়াশোনা করছিল।'

'তাহলে তো ওরা শেষমেশ আপনাকেই সন্দেহ করবে। সর্বশেষ তো আপনিই রতনের সঙ্গে ছিলাম।' ফজু বলল।

'ঠিকই বলেছিস। সন্দেহটা আমার ওপরে পড়ে। কারণ রাত প্রায় দশটা অবধি রতন আর আমি দাবা খেলি। রতন শেষ দানে জিতে তারপরে খেলায় ক্ষান্ত দেয়। দাবার বোর্ড আর ঘুটি ওর পড়ার টেবিলের উপর রেখেই আমি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আর সে কারণেই আমি মরিয়া হয়ে রতনের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে উঠেপড়ে লাগলাম।'

'এখনও কোনো ক্লু পাননি?' ম্যাকু জিজ্ঞেস করল।

'হু। ক্লু পেয়েছি। রতনের রুম থেকেই। কারণ ওর রুম আমার চেয়ে আর ভালো কেউ চেনে না। সেই অনুযায়ী তদন্ত শুরু করলাম। তদন্তের সূত্র ধরে এগিয়ে গেলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। সেখানে যা থাকার কথা ছিল নেই। তারপর রতনের দেয়া ক্লু থেকেই বের করে ফেলল কে বা কারা ওইদিন মাঝরাতে এসে নিঃশব্দে রতনকে তুলে নিয়ে গেছে। জমিদারমশাইকে জানাতেই থানা পুলিশকে করে রতনকে জঙ্গলের এক পরিত্যক্ত কুটিরে পাওয়া গেল। আমার তাৎক্ষণিক গোয়েন্দাগিরিতে আর আমার ছাত্র রতনের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে দেয়া সূত্র ধরেই আমরা ওকে খুঁজে পেলাম। মুক্তিপণের টাকা দাবি করার আগেই অপরাধীরা ধরা পড়ে গেল।'

'এখন তোরা বল তো দেখি, রতন কি সূত্র দিয়েছিল? আর সেই সূত্র ধরে আমি কীভাবে রতনকে খুঁজে পেলাম। অপরাধী কে বা কারা?'

ভুল

সকালে জগিং শেষে ফিরে এসে নাভিদ দেখে, তার সহকারী জুয়েল বিমর্ষ মুখে বসে আছে। পকেটমার থেকে জুয়েলকে সহকারী করে তোলার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় নাভিদের। জুয়েল কি সেই অতীত জীবনের কথা চিন্তা করে মন খারাপ করছে?

'কিরে জুয়েল, কী হয়েছে? ওরকম মুখ ভোঁতা করে বসে আছিস কেন?

জুয়েল কথা বলতে একটু সময় নিল। তারপর ঢোক গিলে কাতর স্বরে বলল, 'আমার ছোটভাইকে বাঁচান স্যার?'

নাভিদ বিস্মিত স্বরে বলল, 'তোর ছোটভাই পেলি কোথায়? তোর তিনকুলে কেউ নেই বলেই তো এতদিন জানতাম।'

'আপন ছোটভাই নয়। আত্মীয়। চাচাতো ভাই। এই ঢাকাতেই মানুষের বাসায় কাজ করে। এতদিন সব ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু কাল রাতে নজু বাসার ম্যাডামকে খুন আর গহনা চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। ওকে বাঁচান স্যার।'

'তুই জানলি কীভাবে? ব্যাপারটা পেপারে এসেছে নাকি?'

'না স্যার। থানা থেকে ফোন করেছিল। ওর আত্মীয়স্বজন কেউ আছে নাকি জানতে চাইলে থানায় আমার নাম্বারটা দেয়।'

নাভিদের মনে পড়ে গেল যোগাযোগের জন্য আর গোয়েন্দা তৎপরতার অগ্রগতির খাতিরে জুয়েলকে একটা স্মার্টফোন কিনে দিয়েছে সে।

'ঠিক আছে চল থানায় গিয়ে দেখি কেসটা কি? এখন ফোঁপানি বন্ধ কর। গোয়েন্দার সহকারীর কান্নাকাটি করলে ঠিক মানায় না।'

থানায় গিয়ে নাভিদ দেখে পনেরো-ষোল বছরের বেশ দেখতে এক কিশোর ছেলে লকআপে বসে আছে। জুয়েলকে দেখে কিশোর নজু উঠে এগিয়ে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, 'আমি খুন করিনি। আমি চুরি করিনি।'

নাভিদের পরিচিত ওসি নাভিদকে দেখে বলল, 'ব্যাপার কী! এই কেসের

খবর আপনি পেলেন কী করে?'

নাভিদ বাঁকা হাসি দিয়ে বলল, 'গন্ধ শুঁকে শুঁকে।'

'দেখুন কী করতে পারেন। গরিব মানুষ। ওর পক্ষে দাঁড়াবার মতো তো কেউ নেই। তবে করার মতো তেমন কিছু নেই। বলতে গেলে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।'

'কেসটা কী বলুন তো।'

কেস জানা গেল। আজ সন্ধ্যেয় ম্যাডামের ঘরে গিয়ে দেখি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। অনেক সময় ম্যাডাম এরকম সন্ধ্যেয় অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে আর ডাকলাম না। ম্যাডাম সত্যি সত্যি ঘুমিয়েছে কিনা বারান্দার খোলা জানালা দিয়ে দেখলাম। আর দেখেই আমার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। বারান্দাতেই বসে পড়লাম। দেখলাম ম্যাডাম ঘরের মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। ম্যাডামের বুকের মাঝখানে একটা ছোরা গাঁথা। ভয়ে জোরে জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। ম্যাডামের ঘরের দরজায় আবারো কয়েকবার ধাক্কা দিলাম। দেখি ভেতর থেকে বন্ধ। রেজা ভাই বাসায় নিজের রুমে আছেন জানতাম। দৌড়ে চলে এলাম রেজা ভাইয়ের রুমে। দরজা ভেজানো। রেজা ভাই রুম অন্ধকার করে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। আমি গিয়ে হামলে কেঁদে পড়ে রেজা ভাইকে জানালাম ম্যাডাম খুন হয়েছেন। রেজা ভাই থতমত খেয়ে জেগে উঠলেন। তারপর ড্রয়ার থেকে কী একটা বের করে হাতে নিয়ে ম্যাডামের ঘরের সামনে এলেন। দরজার নবের লকে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেললেন। তারপর ভেতরে সব কিছু দেখে শুনে আমাকে বললেন, 'গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো এখনও বেঁচে আছে কিনা। বুকের থেকে আগে ছুরিটা তুলে নে। বেঁচে থাকলে হাসপাতালে নিতে হবে।' তার পরপরই পার্ক থেকে জগিং সেরে স্যার ফিরে এলেন। সব দেখে তিনি মুষড়ে পড়লেন। থানায় ফোন করলেন। পুলিশ এলো।

পুলিশ অফিসার জানালেন, 'থানা থেকে ফোন পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। তারপর বলতে গেলে চাকর ছেলেটাকে একপ্রকার হাতেনাতেই ধরে ফেলি। ছুরিতে ওর হাতের ছাপ পাওয়া যায়। তাছাড়া বাড়ির মালিক অভিযোগ করেন তার স্ত্রীর নিত্যব্যবহার্য বেশ কিছু গয়না মিসিং। ছেলেটার ঘর সার্চ করে গয়না উদ্ধার হয়।

নাভিদের কেমন যেন সন্দেহ লাগে। সে পুলিশ অফিসারকে বলল, 'ওর সঙ্গে তো কথা বললাম। আমি কি বাকি দুজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন। কিন্তু কথা বলে কোনো লাভ হবে না। আসামি কট রেড হ্যান্ডেড। ওর বানানো কথা বিশ্বাস না করলেই পারেন। সব আসামিরাই ওরকম বলে।'

'ঠিক আছে দেখি, ঘটনার মোড় অন্য দিকে যায় কিনা?'
'কেন, আপনি কি কিছু সন্দেহ করছেন।'
'করছি। কিন্তু তা এখনই বলা যাচ্ছে না।'
প্রথমেই পাওয়া গেল বাড়ির কর্তা রিয়াজউদ্দিনকে। স্ত্রীর শোকে যতটা মুহ্যমান হওয়ার কথা তা মনে হচ্ছে না। বেশ শক্তপোক্ত মানুষই মনে হচ্ছে। নাভিদ জেরা করে তেমন কিছু বের করতে পারল না। উনি শুধু বলছেন আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন। পার্কে জগিংয়ের ব্যাপারটাও অ্যালিবাই হিসেবে বেশ জোরালো। উনি নিয়মিত পার্কে যান। বিকাল পাঁচটায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে পাওয়া গেছে ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছে বিকাল সাড়ে পাঁচটায়। সেই সময় উনি পার্কে জগিংয়ে ছিলেন। তার জগার বন্ধুরা সেই সাক্ষ্য দিয়েছে। তাছাড়া তার তেমন কোনো মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে না। মোটিভ একটা আছে তবে তেমন জোরালো নয়।
'কী মোটিভ?' জুয়েল জিজ্ঞেস করল।
'স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ সারা দুনিয়াতেই একটা কমন ব্যাপার। তেমন কিছু হতে পারে। তাছাড়া নিঃসন্তান দম্পতি তারা। বন্ধ্যা স্ত্রীকে খুন করে পথের কাঁটা সরিয়ে আবার বিয়ে করতে পারেন।'
'সে রকম করতে চাইলে তো সহজেই তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারতেন। তাছাড়া এতটা বয়স হয়েছে এতদিন যখন করেননি তখন এই শেষ বয়সে এসে কেন...' জুয়েল কথা শেষ করতে পারল না তার আগেই নাভিদ বলল, 'সে কারণেই তো বললাম মোটিভ জোরালো নয়।'
ভাইপো রেজাকেও রুটিন মাফিক জেরা করল নাভিদ। 'আপনি তো রুমে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন?'
'হ্যাঁ। নজু নিজেই সেটা দেখেছে। সেই আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে।'
'নজু আপনাকে কী বলে ডেকে তোলে?'
'ম্যাডাম খুন হয়েছে। শিগগিরই আসুন।'
'আপনি তখন কী করেন?'
'আমি তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে চাবি বের করে নিয়ে ছুটে চাচির রুমের সামনে চলে আসি। দরজায় ইয়েল লক থাকার কারণে ভেতর থেকে বন্ধ থাকলেও বাইরে চাবি দিয়ে খুলে ফেলা যায়। দরজা খুলেই দেখি এই অবস্থা।
'চাকর নজুকে সন্দেহ করার কারণ কী?'
'ওকে তো পুলিশেই ধরে নিয়ে গেছে। তারা চাচির শরীরে ওর হাতের ছাপ পেয়েছে। ওর ঘরে চাচির গহনা পেয়েছে। তাছাড়া ঘটনাটা ওই আগে সবাইকে জানায়। চাচির ঘরেই ওর অবাধ যাতায়াত। সেজন্য আমার মনে হয়েছে ওই খুনটা করে গহনাগাটি সরিয়ে রেখে ইয়েল লকের দরজাটা

ভেতর থেকে লাগিয়ে বাইরে এসে টান দিয়ে বন্ধ করে রেখে সবাইকে ডাকাডাকির নাটক করেছে।'

'কিন্তু সন্দেহটা তো আপনার ওপরেও পড়তে পারে। আপনার ঘুমানোর আলিবাই ধোপে টেকে না। শুধুমাত্র নজু ছাড়া সে সাক্ষ্য আর কেউ দেবে না।

আপনিও তো খুন করে দরজা টেনে লাগিয়ে দিয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়তে পারেন।'

'পুলিশ কিন্তু কোথাও আমার হাতের ছাপ পায়নি?'

'হাতের ছাপ মুছে ফেলা যায়।'

'আর গহনাগুলো? ওগুলো তো পুলিশ নজুর ঘরেই জুতোর খাপে পেয়েছে।'

'হু। সেগুলো আপনি সরিয়ে আগেই নজুর ঘরের জুতোর খাপে রেখে পুলিশকে জুতোর খাপ দেখিয়ে দিয়েছেন।'

'আপনি এসব কিছু প্রমাণ করতে পারবেন?'

'পারব। আপনার প্রতিটি কথা রেকর্ড হয়ে আছে। আর এর মধ্যেই আপনি আপনার হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে ফেলেছেন। আর আপনার মোটিভটাও পরিষ্কার।'

'মোটিভ কী?'

'নিঃসন্তান চাচিকে খুন করে চাচার সব সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হওয়া। কী বলেন রেজা সাহেব? নিজের বেশি চালাকিতেই ধরা খেয়ে গেলেন? অফিসার, আপনাদের প্রকৃত অপরাধীকে পাকড়াও করুন।'

এখন পাঠক বলুন তো, রেজাই যে অপরাধী তা গোয়েন্দা নাভিদ কীভাবে বুঝতে পেরেছে। রেজা কথোপকথনের মধ্যে কি ভুল বলেছে?

ওল্ড কিউরিও শপে চুরি

এরকম ঝামেলায় যে পড়বে তা কখনও ভাবেনি শাহীন। একটা পুরোনো এন্টিক জিনিস কিনতে এসে চুরির দায়ে আটকা পড়ে থাকতে হবে, তা সে কস্মিনকালেও কল্পনা করেনি। তাহলে কারোর জন্মদিনে এন্টিক গিফট দেয়ার ভূত মাথায় চাপত।

বন্ধু রায়হানের জন্মদিনের গিফটে ব্যতিক্রম আনার চেষ্টায় শাহীন এন্টিকের দিকেই ঝুঁকেছে। কারণ রায়হানের নানান বাতিকের মধ্যে পুরোনো জিনিসপত্র কালেকশনের শখ একেবারে সেই শৈশবের। ডাকটিকিট কালেকশন দিয়ে হাতেখড়ি। পরে দেশবিদেশের পুরোনো কয়েন জমাতে থাকে। কয়েন জমাতে জমাতে কখন যে এটা নেশার মতো রক্তে ঢুকে গেছে, তা রায়হান নিজেই জানে না। তাই ধনাঢ্য বাবার সন্তান হওয়ার সুবাদে বেতনের সিংহভাগ টাকা এন্টিক জিনিসের পেছনে চলে যায়। এতে ওর গায়ে বাধে না।

জন্মদিনে একটা নতুন ধরনের কিছু দেয়ার লক্ষ্যেই শাহীন এন্টিকের খোঁজে বেরিয়েছিল। রায়হানের শখ বলে সে কোথায় কোথায় এন্টিক শপ আছে তা ওর নখদর্পণে। কিন্তু শাহীনের সে খোঁজ জানা নেই। রায়হানের কাছ থেকে জেনে নেয়া যায়, তাহলে জন্মদিনের সারপ্রাইজ এক্কেবারে মাটি।

পুরোনো ঢাকার গলির পর তস্য গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শাহীনের একবার মনে হয়েছিল, এন্টিকের ভূত মাথা থেকে বের করে অন্য কিছু কিনে ফেলে। কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল, একবার রায়হান এরকম একটা গলির দিকে তাকিয়েই একদিন বলেছিল, 'একটা চায়না কিওরিও শপ আছে এই গলিতে। আমি মাঝে মধ্যে আসি।'

রায়হানের সেই কথার সূত্র ধরেই শাহীন সেই গলি দিয়ে এগিয়ে গেল। সামনে আরেকটা গলি। গলির দুপাশের দোকানগুলোতে কোনোটাই কিওরিও শপজাতীয় কিছু মনে হচ্ছে না। হরেকরকমের হাবিজাবি জিনিসের

দোকান। নাটবল্টু থেকে শুরু করে রোবট সবই আছে মনে হয় এসব দোকানে। এরই মধ্যে একটা দোকানের মাথায় রঙ ওঠা ম্যাড়মেড়ে চায়না ধাঁচের বাংলা অক্ষরে লেখা দেখল 'ওল্ড কিউরিও শপ।' এই তো, এখানেই তো তাহলে মজার নতুন জিনিস পেয়ে যেতে পারি। এরকম দোকানই তো খুঁজছিল সে।

দোকানটা কেমন যেন অন্ধকার ধরনের। ঢোকার মুখটাও বেশ ছোট। ভেতরে ইলেকট্রিক বাতির বদলে মোমবাতিদানে মোমবাতি জ্বলছে। মনে হয় এন্টিক শপের ধ্যানধারণা ক্রেতার মনে ভালোভাবে ঢোকাতেই এই ব্যবস্থা। ভেতরে ঢুকতেই একজন বিচিত্রদর্শন লোক দেখা গেল। মালিক নাকি বিক্রেতা বোঝা যাচ্ছে না। পাহাড়ি বাঙালি নাকি চেনা-বোঝা দায়। মুখখানা গোলগাল, দুদিকে চিকন সুতোর গোঁফ, গায়ে কালো আলখাল্লা, মাথায় জাদুকরদের মতো সূঁচালো ঊর্ধ্বমুখী টুপি। গায়ের কালো আলখাল্লার মধ্যে লাল কালিতে চাইনিজে কী যেন লেখা, তার মধ্যে ড্রাগনের ছবি। লোকটার চোখের দৃষ্টিও যেন কেমন, সরু কুতকুতে চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

শাহীন ভেতরে ঢুকতেই খাঁটি বাংলা ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'দেখুন, কী নেবেন? সব সভ্যতার জিনিসই আছে এখানে? মিশরীয়, পেরু, ইনকা, চায়না।'

শাহীন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভেতরে ঢুকল। দোকানের প্রবেশদ্বার ছোট হলেও কি হবে, ভেতরটা অনেক বিশাল। পেছনের দিকটা যে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে! কিউরিও শপের জিনিসপত্র দেখেও কেমন যেন ধন্ধে পড়ে গেছে শাহীন। এই সব পুরোনো আমলের জিনিস থাকে নাকি এখানে! অদ্ভুত অদ্ভুত সব পুরাকালের মূর্তি, কোনটা নটরাজের, কোনটা গরুড়ের, কোনটা চামুন্ডার। প্রকা সব চীনে ভাস। পাথরের মূর্তি, ব্রোঞ্জের পানপাত্র, কী নেই এখানে। সবই তো অনেক দামি জিনিস মনে হচ্ছে। কিন্তু শাহীনের বাজেটটা তো অত বেশি নয়। তবুও পুরোনো জিনিস যখন আগে পছন্দ হোক। তারপর দরদাম করা যাবে।

'বন্ধুর জন্মদিনে উপহার দেব, এরকম একটা এন্টিক জিনিস খুঁজছি। ওর আবার এন্টিকের খুব শখ।'

'হুঁ, বুঝতে পেরেছি। জন্মদিনের উপহারের একটা সেকশন আছে। ঘুরে দেখতে পারেন। যেটা পছন্দ হবে আমাকে দেখাবেন। ওই যে, আরেকজন কাস্টমার এলো বোধহয়।'

দোকানির দৃষ্টি অনুসরণ করে শাহীনও সেদিকে তাকাল। কাঁধে একটা টিয়া পাখি। গলায় লাল ছোপের সবুজ টিয়া নিয়ে একজন অদ্ভুতদর্শন লোক দোকানে প্রবেশ করল। প্রথম দেখাতেই মনে হবে ভবঘুরে বা ক্যানভাসার,

কিন্তু একটু ভালো করে দেখলে বোঝা যাই ম্যাজিশিয়ান বা জাদুকর। লোকটা ঢুকেই বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করল, 'পুরোনো ভুডু পুতলের কোনো কালেকশন আছে? দেখাতে পারবেন?'

'আসুন, আসুন, কিরকম ভুডু চাই বলেন। আমার এখানে শতেক রকমের কালেকশন আছে। ভুডু সেকশনে যান।'

শাহীন যখনই জন্মদিনের উপহার সেকশনে ঢুকতে যাবে তখনই তার মনে হলো দোকানে বুট জুতোর শব্দ তুলে কেউ একজন ঢুকল। এই গরমের মধ্যেও ওভারওল গায়ে, মাথায় পর্যটকের টুপি, ঝাটা গোঁফের লম্বাচওড়া একজন মানুষ ঢুকল, পায়ে বুট জুতো। ঢুকেই একটা বীভৎস চেহারার বদখত মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জ্বলজ্বলে চোখে বলল, 'এই মূর্তিটাই তো আমি এতদিন খুঁজছিলাম। এটা এখানে কেন? কে এনেছে?'

দোকানি বিগলত স্বরে বলল, 'স্যার, এন্টিক সংগ্রহই আমার কাজ। আর কে কখন কোথা থেকে কীভাবে আনা তার সব খোঁজ কি আর থাকে! আপনার কী দরকার তাই বলুন।'

'এই মূর্তিটাই আমার চাই।' লোকটা মূর্তিটা হাতে নিল। বোঝাই যাচ্ছে বেশ ভারী। হাত দেড়েক লম্বা।

'এই মূর্তিটা দেওয়া যাবে না স্যার। এটা অর্ডারি মূর্তি। একজন অর্ডার দিয়েছে। আজই নিয়ে যাবে। সেজন্য এখানে টেবিলের উপর রেখেছি।'

'যে অর্ডার দিয়েছে তাকে অন্য কোনো মূর্তি ধরিয়ে দিন। আপনার এখানে তো অনেক মূর্তি আছে। আমার এটাই চাই। যা টাকা দিয়েছে আমিও তাই দেব।'

'তা হয় না স্যার।'

ওদের কথাবার্তায় আকৃষ্ট হয়ে শাহীন নানা মূর্তির গা ঘেঁষে ভেতরে ঢুকল। জন্মদিনের সেকশনটা তুলনামূলক অনেক সুন্দর। থরে থরে সাজানো জিনিস দেখে শাহীন মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে মুগ্ধ হলো ভেলভেটে মোড়ানো একটা গোল জারের মতো জিনিস দেখে। জিনিসটা সত্যি আশ্চর্য। একটা ঈষৎ গোল জারের মতো গড়ন কিন্তু ওপরে কি সুন্দর পলকাটা। সেই পলকাটা জিনিসটা হীরের মতো দেখতে হলেও ক্রিস্টালের তা বোঝা যায়।

এর পরে দোকানে ঢুকল এক অভিজাত ভদ্রমহিলা। তার একটা আট ইঞ্চি উঁচু বনসাই গাছ চাই। বনসাই সেকশনে ঢুকে বটগাছের বনসাই সাইজ মাফিক খুঁজতে লাগল। পেয়েও গেল কিছুক্ষণের মধ্যে, ভদ্রমহিলা সেটা হাতে নিতেই দোকানির তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল। 'কেউ জায়গা থেকে একচুলও নড়বেন না। একদম না। আমার এখন থেকে একটা বহুমূল্যবান এন্টিক এইমাত্র চুরি হয়ে গেছে।' বলতে বলতে দোকানি দোকানের দরজা

লাগিয়ে দিল। তারপর মোবাইল বের করে ফোন দিল থানায়।
বুটজুতোওয়ালা ধমকের স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী চুরি হয়েছে মশাই?'
'একটা রুবি পাথরের হার। আমি এই পরির মূর্তির গলায় পরিয়ে রেখেছিলাম। ওটাই মিসিং।'
শাহীনসহ সবাই দোকানে আটকা পড়ে গেল। আর তখনই কে যেন ফুঁ দিয়ে একে একে মোমবাতি দানের সবগুলো মোমবাতি নিভিয়ে দিল।
দোকানের বাইরে থেকে আসা আলোয় দেখা গেল সবাই যে যার মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুটজুতোর ভদ্রলোক প্রথমে একটু হম্বিতম্বি করলেও পুলিশের কথা শুনে ঝিম মেরে গেল।
শাহীনও হতভম্বভাবে দাঁড়িয়ে রইল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুলিশ হাজির। পুলিশের কর্মতৎপরতা যে এমন শাহীন বিশ্বাসই করতে পারেনি। দোকানির কাছ থেকে সব শুনে পুলিশ সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়েই সবাইকে সার্চ করতে লাগল। ভদ্রমহিলাকে সার্চ করার জন্য একজন মহিলা পুলিশও এলো। কিন্তু সার্চ করে কারোর কাছ থেকেই হারানো জিনিস উদ্ধার করা গেল না। তখনই শাহীনের মনে হলো, জিনিসটা কোথায় কার কাছে আছে সে জানে এবং কীভাবে চুরি হয়েছে তাও সে বুঝতে পেরেছে।

পাঠক বলুন তো, কে হারটি চুরি করেছে? এবং শাহীন কীভাবে তা বুঝতে পারল?

মিলিয়ে নিন গোয়েন্দাকাহিনির উত্তর

১. তিন মাস আগের ঘটনা কারোরই পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে থাকার কথা নয়, যদি না ব্যাপারটা শেখানো বা আরোপিত হয়। কিন্তু হত্যাকারী এই ভুলটাই করেছে। তিন মাস আগের ঘটনার খুব ভালোভাবে জবানবন্দি দিয়েছে। এমনকি একই জবানবন্দি পনেরো দিন পরেও হুবহু একই রকম দিয়েছে। যেখানে বাকি চৌদ্দজন পরের বার আরেকটু ভুল করেছে। পনেরো দিনে স্মৃতিশক্তি কিছুটা দুর্বল হয়। আগের জবানবন্দির সঙ্গে পরের জবানবন্দির মিল না থাকাই স্বাভাবিক। শুধু একজনেরই মিলেছে।

২. খাবারে বিশ মিশিয়েছিল রাঁধুনিশিল্পী বিনীতা রুমা। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেয়ার মানসে মাথার চুলের খোঁপার মধ্যে রাখা বিষাক্ত মাশরুম মিশিয়ে দিয়েছিল সায়েমা সাদেকের চায়ের কাপে, যে কারণে কেউ ধরতে পারেনি।

৩. মুহিবুল আলমকে খুন করেছে, অপরাধবিজ্ঞানী প্রফেসর আলিম। খুনটা করেছেন গলায় দড়ির ফাঁস পেঁচিয়ে জোরে টান দিয়ে শ্বাসরোধ করে। কারণ তিনি বাম হাতি। ডাক্তার লাশের গলায় দড়ির গিঁটটা ডান দিকে দেখতে পেয়েছেন। যেটা বাম হাতিরা গিঁট দিয়ে টান দেয়ার সময় ও দিকটাতেই যায়। আর গলায় দড়ি দেয়াটাই আগে হয়েছে। কারণ দড়ি দিয়ে ফাঁস দিয়ে গাছের গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তারপর পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসলাম হক পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে। সবশেষে তলোয়ারবাজ খাজা নঈম দাঁড়ানো লাশের গলায় তলোয়ারের কোপ দিয়েছে। কারণ আগে কোপ দিয়ে গলা ফাঁক করা থাকলে গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস আঁটা সম্ভব নয়।

৪. পলাশ। কারণ নাভিদ অধ্যাপক করিমের প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র রাহুল, রাজন, শফিকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছে তারা প্রত্নমূর্তি সবকিছু সম্বন্ধে বেশ ডিটেলসই জানে। শুধু পলাশই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে। এমনকি প্রত্নতত্ত্বের মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সে মূর্তিটা ঠিকমতো বুঝতে পারেনি, ওটা ইঁদুর বেড়াল ব্যাঙ না শেয়াল। অর্থাৎ ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে।

৫. মন্টুর বাবার খাম, মায়ের নোটপ্যাড এবং বাবার পত্রিকার ভুলভাল কাটিং দেখেই হেকিম মুনশির সন্দেহ জাগে। তারপর মুক্তিপণের চিঠিতে যখন দেখতে পায় অন্য এক শহরে এক ঘণ্টার মধ্যে যেতে বলা হচ্ছে তখনই তার সন্দেহটা গাঢ় হয়, এই কাজ মন্টুই করতে পারে। কারণ বাবার খাম, মায়ের প্যাড, বাবার পত্রিকা সবই তার হাতের নাগালে। মুক্তিপণের ঘটনাটাও সে পত্রিকায় পড়েছে। শুধু পথের দূরত্বের ব্যাপারটা জানা না থাকায় মাথায় আসেনি। এই সপ্তাহ বাবার কাছে থাকার কারণেই কাজটা ওর জন্য সহজ হয়েছিল। আয়ার চোখের আড়াল হয়েই ও আগে থেকে গুছিয়ে রাখা চিঠিটা বাবার ডাকবাক্সে ফেলে ম্যাকগাইভার কী দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে গিয়ে একটা গোপন কাবার্ডের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে, যাওয়ার আগে ফ্রিজ থেকে খাবার দাবার নিতে চালাক মন্টু একটুও ভুল করেনি।

৬. হায়দার আলীর মৃতদেহ বাড়ির বিশাল ডিপ ফ্রিজারে রাখা আছে। জুয়েল ফ্রিজারটা দেখে এসেছিল। ওরা দুভাই লাশটাকে ফ্রিজারে রাখার জন্য ফ্রিজারের সমস্ত খাবার গরিব-মিসকিনদের দান করেছিল, আর তাতেই নাভিদের সন্দেহ দানা বাঁধে।

৭. জমিদারের বন্ধু লক্ষ্মীকান্ত জমিদার। কারণ জমিদারের হাতে মোম লাগানো ছিল। হীরের ধরন আর মোমের ধরন প্রায় একই রকম। তিনি হীরেটা চুরি করে একটা মোমের বাতির মধ্যে নিচের দিকে লুকিয়ে ফেলেন। মোমটা তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধার জন্য পাইটের ঠান্ডা মদ তার উপরে ঢেলে দেন। মোম জমাট বেঁধে যাওয়ায় হীরেটা ওর মধ্যেই থেকে যায়। বাইরে থেকে আর দেখা যায় না।

৮. জামসেদ চৌধুরীকে খুন করেছে তার স্ত্রী ও শ্যালক। কারণ দুইবার টেনিস কোর্টের সার্কিট ব্রেকার পড়ে যাওয়ার সময় এই দুইজন তাদের জায়গা বদল করে ফেলে। আর বাড়ির সার্কিট ব্রেকারের সুইচ কোথায়, তা এই দুইজন ছাড়া আর কারোর জানার কথা নয়। টেবিলের ওলটপালট ছবিতেই তার প্রমাণ। ফুলের টবের ফুলে সাদার পাশাপাশি অরেঞ্জ রঙের ফুল প্রমাণ করে জামসেদ চৌধুরীর গ্লাসের বিষ মেশানো অরেঞ্জ তিতকুটে অরেঞ্জ জুসটাই তার স্ত্রী সার্কিট ব্রেকারের অন্ধকারের মধ্যে ফুলের টবে ফেলে দেন। তারপর জামসেদ চৌধুরীর হাতে একটা নির্ভেজাল অরেঞ্জ জুসের গ্লাস ধরিয়ে দেন, যে কারণে গ্লাসে কোনো কিছু পাওয়া যায়নি।

৯. রীমাকে অপহরণ করেছে ওর বৈধ অভিভাবক মিস শায়লা । তার কথার মধ্যেই অসঙ্গতি পাওয়া গেছে । অন্য সবাই যেখানে দুপুর পর্যন্ত ফোনে রীমার সঙ্গে কথা বলেছে, সেখানেই শায়লাই জানিয়েছে সকাল থেকেই রীমার মোবাইল বন্ধ ছিল । দ্বিতীয়ত অপহরণকারীরা ঠিক দশ লাখ টাকাই দাবি করেছে, শুধুমাত্র যে টাকাটাই রীমার অ্যাকাউন্টে আছে এবং একমাত্র শায়লাই সেটা জানত । বাইরের অপহরণকারী হলে তা জানার কথা নয় ।

১০. শোকর কালা কানে শোনে না তাই কমান্ডারের সংকেত ছিল যখন ওর মাথায় চড় দেয়া হবে তখন শোকর গুলি শুরু করবে । পিঠে চড় দিলে পিঠটান । আর পশ্চাৎদেশে চড় দিলে গুলি বন্ধ । অস্ত্রসহ পালাতে হবে । কিন্তু শোকর কালা বসে থাকায় লোকমান ভুল করে শোকরের পিঠে চড় দিয়ে পিঠটান দিতে বলার বদলে মাথায় চড় দিয়ে বসে । শোকর কালা বসে থাকায় লোকমান শোকরের মাথাকেই পিঠ ভেবেছিল ।

১১. খুনি অশ্বিনী কামার । কামার হওয়ার কারণে ঘোড়ার নাল তৈরি করা তার কাছে অতি সহজ । সে-ই ঘোড়ার খুরের আকৃতির লোহার মুগুর তৈরি করে সহিসের বুকে জোড়া আঘাত করেছে । কিন্তু আঘাতটা হয়ে গেছে ভুলভাবে । ইংরেজি উল্টো ইউ বা গোলাকৃতির এ-এর মতো । কিন্তু ঘোড়া পেছন পায়ে আঘাত করলে বুকের আঘাতের যে দাগ থাকত তা অবশ্যই ইংরেজি ইউ-এর মতোই হতো । তা দেখেই নাভিদ বুঝতে পারে ।

১২. চোর অ্যান্টিক ব্যবসায়ী সমর মজুমদার । ঐতিহাসিক জিনিসের মূল্য তিনিই ভালো জানেন । হেকিম মুনশি সমর মজুমদারের এক নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়া দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন । কারণ মুখ বন্ধ রেখে সিগারেটের ধোঁয়া এক নাক দিয়ে ছাড়া যায় না, যদিও অন্য নাকের ভেতরে কিছু থাকে । সমর মজুমদার হীরেটা তার নাকের ফুটোর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন ।

১৩. চুরিটা করেছে মনি মোহন সাহার দোকানের কর্মচারী নিরাপদ । কারণ একমাত্র সে-ই জানত না যে মনি মোহন সাহার আগুনভীতির কারণে শোবার ঘরের দরজা খোলা থাকে । আর জানত না বলেই দরজায় লোহার পাত দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে দাগ রেখে গেছে । সেই দাগ দেখেই দাদু বুঝতে পেরেছেন ।

১৪. মূর্তি চোর সাকির। নয়ন নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার বলার সময় সাকির উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল, কারণ নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার মনে রাখাটা বেশ কঠিন। সেজন্যই সে উঠে গিয়ে সেগুলো মনে রেখে লিখে রাখতে চাইছিল।

১৫. বন্ধু পদার্থবিজ্ঞানী আদিলুর রহমান। আদিলুর রহমানের মাছ ধরার নেশা। তিনি বড়শি-হুইল এসব নিয়ে থাকেন। জানালার পাশে থাকা মেইন গ্যাস লাইনের মেইন ককের আকৃতি তারার মতো। আদিলুর রহমান জানালার ফাঁক দিয়ে ছিপ বড়শি ঢুকিয়ে মেইন ককের তারার সঙ্গে বাঁধিয়ে বাইরে থেকেই মেইন কক খুলে ফেলেছেন। তারপর ছিপ টেনে বের করে নিয়েছেন। যে কারণে জানালার গায়ে শিকের দাগ পাওয়া গেছে।

১৬. সুমনের হত্যাকারী ওর বন্ধু তপন। তপনের কথাতেই অনেক অসংগতি বেরিয়েছে। শুক্রবার। ছুটির দিন। কিন্তু ও ব্যাংকে যাওয়ার কথা বলেছে। নাভিদ কৌশলে মাত্র দুজনের হাতের ছাপ নিয়েছে। হামিদার আর তপনের। মদের বোতলে তপনের হাতের ছাপের সঙ্গে এনড্রিনের শিশির হাতের ছাপের মিল পাওয়া গেছে। তপনই মদের বোতলে কীটনাশক মিশিয়েছিল। সাজু না থাকলেও সাজুর ফ্ল্যাটে গিয়ে তপন মদপান করবে। সেই মদের বোতলেই ও মিশিয়ে রেখেছিল। দোষটা সাজুর ঘাড়ে পড়ুক।

১৭. গণেশ ঠাকুর মনিদি চুরি করেছে। কারণ তারই ওই ঘরে যাতায়াত বেশি। গণেশ ঠাকুর এক হাত লম্বা, আধহাত চওড়া, ওজন বিশ-পঁচিশ কেজি। কাজেই ওটা কোনো ছোট জিনিস নয়, নিতে গেলে সবার নজরে পড়বে। ওজনে ভারী হওয়ায় পুরুত ঠাকুর ও তার সাগরেদের মতো রোগাপটকা হ্যাংলাপাতলা লোকের পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়, ওদের ডালা বা থালিতে ওটা আটবে না। তেমনি বুড়ো রমেন খুড়োও নিতে পারবে না। তাছাড়া তার বাজারের ব্যাগ খালি। চামড়ার ছোট্ট ব্যাগে করে কর্মচারী সুধাংশু ওটা নিতে পারবে না। তেমনি পারবে না গোপাল টিফিন ক্যারিয়ারে করে। একমাত্র মনিদিই পুজোর ঘর পরিষ্কার করার সময় বালতির ময়লা পানির মধ্যে চুবিয়ে ওটা বের করতে পারে। তারপর ময়লা গাড়ির সঙ্গে যোগসাজশ করে পাচার করার মতলব ছিল। ময়লার বালতিটা নিশ্চয় সে তার বাথরুমে রেখেছে।

১৮. অমি কুকুরকে দেখেই কুকুরের মালিককে খুনি হিসেবে শনাক্ত করে। কারণ কুকুরটা যখন অমিদের কামরায় এল তখন রেলের আবছা আলোয় কুকুরের কালো কালো পায়ের ছাপ দেখেছিল। সোডিয়াম বাতিতে রক্তের লাল রঙই ওরকম কালো ছাপ দেখাচ্ছিল। তাতেই অমির সন্দেহ হয়। সেজন্য ও খুনের ঘটনাস্থলে গিয়েও রক্তের মধ্যে কুকুরের ছোট ছোট পায়ের ছাপ দেখতে পায়। চিরুনি তল্লাশি করে যখন কোথাও হীরেগুলো পাওয়া যায় না তখনই অমির সন্দেহ হয় কুকুরের গলায় মোটা সোটা বকলেসের ওপর। কুকুরের গলার চামড়ার বকলেস তো অত মোটা হয় না। তাহলে নিশ্চয় ওটা বিশেষভাবে বানানো। ফাঁপা। ওর মধ্যেই হীরে থাকতে পারে।

১৯. চোর রন্টুর মা। চুরি হীরে রন্টুর মায়ের কানের মধ্যে হেয়ারিং এইডের নিচে গুঁজে রাখা ছিল। হেয়ারিং এইড মেশিন ঠিকঠাক থাকার পরেও রন্টুর মা কানে শুনতে পাচ্ছে না দেখেই রাশেদের খটকা লাগে। তাহলে নিশ্চয় ওর নিচে হীরে থাকার কারণে হীরের প্রতিবন্ধকতায় মেশিন কাজ করছে না।

২০. হত্যাকারী বেয়ারা হাফিজ। সে নিশানায় দক্ষ, হাতসাফাইয়ে অভিজ্ঞ। তার হাতের ছোট্ট ছয় ইঞ্চির পিস্তল। সেই ছোট্ট নকল পিস্তল হাতসাফাই করে আসল পিস্তল দিয়ে গুলি করেছে। ছোট্ট পিস্তলের ছোট্ট সাইজের গুলিতে আহমেদ মুস্তাফার কপালে ছোট্ট একটা ক্ষত হয়েছে। আর তাই দেখেই হেকিম মুনশি খুনি কে তা ধরতে পেরেছে।

২১. রতন দাবার বোর্ডের ঘুটি ঘোড়াটা নিচে ফেলে সূত্র দিয়েছিল, সেই সঙ্গে কালো কাপড়ের বেল্ট মানে ব্লাকবেল্ট হলো কারাটে মাস্টারের। অর্থাৎ ঘোড়দৌড়বিদ জালাল খাঁ আর কারাটে মাস্টার ওয়াংচু মিলে ওকে তুলে নিয়ে গেছে। মেঝেতে ধস্তাধস্তিতে বোঝা যায় রতন চেষ্টা করেছে তখন জুজুৎসুর প্যাঁচে ফেলে ওকে কাবু করেছে। দাবার ঘোড়া থেকেই মুনশি বুঝতে পেরেছে ওকে ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই বৃষ্টিভেজা পথে ঘোড়ার খুরের দাগ দেখেই ওরা কোনোদিকে গেছে বুঝতে পেরেছে।

২২. রেজার সবচেয়ে বড় ভুল সে ম্যাডামের দরজা খোলা কি বন্ধ তা না জেনেই ইয়েল লক খোলার জন্য আগেভাগেই চাবি নিয়ে দরজা খুলেছে। চাকর নজু রেজাকে একবারও জানায়নি ম্যাডামের দরজা

ভেতর থেকে লক করা। কিন্তু রেজাই দরজা লক করে রেখেছিল বলে দরজা খুলতে চাবি নিয়ে গিয়েছিল।

২৩. হারটি চুরি করেছে জাদুকর। জাদুকরের কাঁধের টিয়াপাখির গলায় হারটি পরিয়ে দিয়েছে। টিয়ার গলার লাল রঙের সঙ্গে লাল রঙের রুবি পাথরের হারটি মিশে গেছে। পুলিশ যখন জাদুকরকে সার্চ করছিল তখন জাদুকর টিয়া পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়েছিল। সার্চ শেষে টিয়া পাখি আবার জাদুকরের কাঁধে এসে বসে। তাতেই শাহীনের সন্দেহ হয়।

প্রিন্স আশরাফ। জন্ম : ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, বড়দল, সাতক্ষীরা। বাবা ডা. সফেদ আলী সানা। মা সাহারা খাতুন। পেশায় চিকিৎসক হয়েও লেখালেখিতে অধিক মনোযোগী।

রহস্য, থ্রিলার, হরর, অতিপ্রাকৃত, সায়েন্স ফিকশনের পাশাপাশি মূলধারার গল্প উপন্যাসেও তার দক্ষতা সমানভাবে চোখে পড়ে। শিশুসাহিত্যেও তার পদচারণা লক্ষ্যণীয়। রহস্যপত্রিকা ছাড়াও দেশের সব শীর্ষস্থানীয় পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন।

লেখালেখির পাশাপাশি আলো ও ছায়া নামে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। দৈনিক যায়যায়দিনের সিনিয়র সাব-এডিটরের দায়িত্বে আছেন। রোদ্দুর শিশু কিশোর ম্যাগাজিন সম্পাদনা করছেন। বৈশাখী টিভি চ্যানেলে নাট্যকার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছেন। অনুবাদ সাহিত্যেও তার স্বচ্ছন্দ পদচারণা।

মৃত্যুছায়া, চক্র, মূর্তিরহস্য, ছিন্নমস্তা, পিশাচসাধক, দস্যিপনা, অপচ্ছায়া, একাত্তরের রঙিন ঘুড়ি, সুন্দরবনে শিহরণ, মগজধোলাই, আগুনের ফুল তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

বিশাল বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, দেশজ পাণ্ডুলিপি পুরস্কার, কিশোর কলম সাহিত্য পুরস্কার, প্রিয় বাংলা পাণ্ডুলিপি পুরস্কার, অক্ষরবৃত্ত পাণ্ডুলিপি পুরস্কার লাভ করেন।

নিভৃতচারী লেখক সুলেখিকা স্ত্রী তাহমিনা সানি, কন্যা সারাহ ও পুত্র রিহানকে নিয়ে বাস করেন আপন ভুবনে।

ISBN : 978-984-8025-52-9

Ditective Hekim Homes
by Prince Ashraf

Price : : 250 Tk : : 12$
Cover Design : : Niaz Chowdhury Tuli
Babui : : Dhaka : : Bangladesh